Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

IOM

Islamic Online Madrasah

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

পশ্চিমা সংস্কৃতির প্রভাব মুসলিম পারিবারিক কাঠামোর উপর

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওলানা মাহবুবুর রহমান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

মোছাঃ নাদিয়া বেগম লিনা

রোলঃ 23090120263

২০ নভেম্বর, ২০২৫ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

পশ্চিমা সংস্কৃতির প্রভাব মুসলিম পারিবারিক কাঠামোর উপর

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওলানা মাহবুবুর রহমান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

মোছাঃ নাদিয়া বেগম লিনা

রোলঃ 23090120263

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " পশ্চিমা সংস্কৃতির প্রভাব মুসলিম পারিবারিক কাঠামোর উপর " বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে মোছাঃ নাদিয়া বেগম লিনা, আইডিঃ 23090120263 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওলানা মাহবুবুর রহমান
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মাওঃ আরমান হোসাইন
কুরআন ট্রান্সলেশন ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " পশ্চিমা সংস্কৃতির প্রভাব মুসলিম পারিবারিক কাঠামোর উপর " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাওলানা মাহবুবুর রহমান উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব প্রচেষ্টায় প্রস্তুত করা হয়েছে, যেখানে প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন উৎস থেকে সংগৃহীত তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে এবং সেগুলো যথাযথভাবে তথ্যসূত্রে উল্লেখ করা হয়েছে।

নাদিয়া

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

২০ নভেম্বর, ২০২৫ ইং

মোছাঃ নাদিয়া বেগম লিনা

আইডিঃ 23090120263

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

অধ্যায় ১ : ভূমিকা 5

অধ্যায় ২..... 7

মুসলিম পারিবারিক কাঠামো..... 7

অধ্যায় ৩ 16

পশ্চিমা পারিবারিক কাঠামো 16

অধ্যায় ৪..... 19

মুসলিম উম্মাহ ও পশ্চিমা আধিপত্য..... 19

অধ্যায় ৫..... 23

পশ্চিমা সংস্কৃতি 23

অধ্যায় ৬ 28

পশ্চিমাদের সবচেয়ে বড় আগ্রাসন 28

অধ্যায় ৭..... 36

মুসলিম পারিবারিক কাঠামোতে পশ্চিমা সংস্কৃতির প্রভাব..... 37

অধ্যায় ৮ 39

কুরআন-হাদিসের আলোকে পশ্চিমাদের অনুসরণ করারা ভয়াবহ পরিণতি..... 40

অধ্যায় ৯..... 44

ইসলামের আলোকে পশ্চিমা সংস্কৃতির প্রতিকার, প্রতিরোধ ও সমাধান 44

উপসংহার 54

তথ্যসূত্র 57

অধ্যায় ১ : ভূমিকা

গবেষণার পটভূমি ১.১

ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থানা। মানুষের জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত সকল কাজকর্মের যথাযথ দিক-নির্দেশনা ইসলামে রয়েছে। আর পরিবার হচ্ছে মানব সমাজের মূল বৃত্তি এবং দ্বীন প্রতিষ্ঠার প্রথম স্তম্ভ। কিন্তু বর্তমান সময়ে পশ্চিমা সংস্কৃতির অগ্রাসনের ফলে এই পরিবার কাঠামো ধ্বংসের মুখে।

ইসলাম যেখানে ইনসাফ শিখায়, পশ্চিমারা শিখায় সমতা। ইসলামের সাথে এই পশ্চিমা সভ্যতার দ্বন্দটা বহু যুগ আগ থেকেই।

দ্বীন ইসলামের স্পষ্ট শত্রু হচ্ছে পশ্চিমারা। পশ্চিমা সংস্কৃতির মূল ভিত্তি হলো ব্যক্তিস্বাধীনতা, ধর্মনিরপেক্ষতা ও ভোগবাদী চিন্তাধারা। এসব চিন্তাধারা মানুষের ব্যক্তিগত জীবন, পারিবারিক বন্ধন থেকে শুরু করে ধর্মীয় মূল্যবোধে অনেক প্রভাব ফেলছে। ফলে মুসলিম সমাজেও আজ বিবাহ বিচ্ছেদ, গর্ভপাত, অবৈধ সম্পর্ক, ধর্ষণ, সমকামিতাসহ, নিজ সন্তানদের অবহেলা ও পারিবারিক শান্তির অভাব দেখা দিচ্ছে।

আমাদের গোটা জীবন পরিচালনা করার জন্য কুরআর আর রাসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সুন্নাহ আছে। কিন্তু বর্তমান সময়ে আমরা কুরআন-সুন্নাহ থেকে দূরে আছি। চাক-চিক্যময় পশ্চিমা ছাকনীতে রঙিন করে দুনিয়া দেখা শুরু করেছি। অথচ এই চাকচিক্যময় রঙিন ছাকনির পিছনে রয়েছে পশ্চিমাদের উন্নতি আর আমাদের অবনতি। আমাদের অবনতি এতোটা প্রসার হয়েছে যে দুনিয়ার পাশাপাশি আখিরাতকেও আমরা ধ্বংসের মুখে নিয়ে নিচ্ছি।

আমাদের উচিত ছিলো, ইসলামের চশমায় দুনিয়া দেখা কিন্তু আমরা নিজেরটা রেখে পশ্চিমাদের চশমা লাগিয়ে দুনিয়া দেখা শুরু করেছি।

১.২ গবেষণার প্রয়োজনীয়তা

কুরআন সুন্নাহর বিধি-বিধানের বৃহৎ অংশ জুড়ে রয়েছে পরিবার। মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তার প্রিয় হাবিব (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর মাধ্যমে এসব বিধি-বিধান মানবজাতিকে জানিয়ে দিয়েছেন। কারণ, মানব জীবনের প্রথম ভিত্তি হচ্ছে পরিবার। ব্যক্তি পরিবারের একটা অংশ আর পরিবার সমাজের অংশ। পরিবার ঠিক হলে ব্যক্তি ঠিক হয়ে যায়। আর ব্যক্তি ঠিক হয়ে গেলে পরিবার ও সমাজ উভয়েই ঠিক হয়ে যায়।

এজন্য মুসলিম সমাজের পারিবারিক কাঠামো রক্ষা করা খুব জরুরী। পশ্চিমা সংস্কৃতির প্রভাবে পারিবারিক কাঠামোগুলো আজ হুমকির মুখে। এ বিষয়ে গবেষণা অত্যন্ত প্রয়োজন।

কারণ গবেষনার মাধ্যমে বুঝা যাবে, কিভাবে পশ্চিমা সংস্কৃতি মুসলিম পারিবারিক কাটামোকে প্রভাবিত করছে এবং

ইসলামের দৃষ্টিতে এই সংস্কৃতির প্রতিকার কি হতে পারে।

১.৩ গবেষণার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য

- ❖ মুসলিম ও পশ্চিমা পারিবারিক কাঠামোর ভিত্তি তুলে ধরা।
- ❖ পশ্চিমা সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ করা।
- ❖ পশ্চিমাদের সবচেয়ে বড় আগ্রাসন তুলে ধরা।
- ❖ মুসলিম পারিবারিক কাঠামোতে পশ্চিমা সংস্কৃতির প্রভাব চিহ্নিত করা।
- ❖ কুরআন - হাদিসের আলোকে পশ্চিমাদের অনুসরণ করার ভয়াবহ পরিণতি তুলে ধরা।
- ❖ ইসলামের দৃষ্টিতে পশ্চিমা সংস্কৃতির প্রতিকার, প্রতিরোধ ও সমাধান উপস্থাপন করা।

১.৪ গবেষণার পদ্ধতি

- প্রথম উৎস : কুরআন মাজীদ, সহিহ হাদিস।
- দ্বিতীয় উৎস : তাফসীর, ফিকহগ্রন্থ, ইসলামিক স্কলারদের বক্তব্য।
- তৃতীয় উৎস : সমসাময়িক অবস্থাকে ইসলামী আদর্শের সাথে তুলনা করা।

অধ্যায় ২

মুসলিম পারিবারিক কাঠামো

আদম (আঃ) ও হাওয়া (আঃ) এর দাম্পত্য জীবনের মাধ্যমে পৃথিবীতে প্রথম পরিবার গড়ে উঠেছে। একে একেই এই পরিবার বিস্তৃত হয়েছে পুরো দুনিয়াতে। সৃষ্টির সূচনালগ্ন থেকেই পরিবার প্রথা চালু আছে।

আল্লাহ সুবাহান তা'লা বলেন,

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقۡنٰكُمۡ مِّنۡ ذَكَرٍ وَّاُنۡثٰى وَجَعَلۡنٰكُمۡ شُعُوۡبًا وَّقَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوۡا ؕ اِنَّ اَكۡرَمَكُمۡ عِنۡدَ اللّٰهِ اَتۡقٰٮكُمۡ ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيۡمٌ خَبِيۡرٌ

অর্থ : হে মানুষ! আমি তোমাদের সকলকে এক পুরুষ ও এক নারী হতে সৃষ্টি করেছি এবং তোমাদেরকে বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে বিভক্ত করেছি, যাতে তোমরা একে অন্যকে চিনতে পার। প্রকৃতপক্ষে তোমাদের মধ্যে আল্লাহর কাছে সর্বাপেক্ষা বেশি মর্যাদাবান সেই, যে তোমাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বেশি মুত্তাকী। নিশ্চয়ই আল্লাহ সবকিছু জানেন, সবকিছু সম্পর্কে অবহিত। [১]

স্বামী-স্ত্রীর দাম্পত্য জীবনের মাধ্যমে গড়ে উঠে পরিবার। আমাদের মুসলিম সমাজের দুই ধরনের পরিবার দেখা যায় :

১. একক পরিবার এবং

২. যৌথ পরিবার

একক পরিবার মুলত মা-বাবা ও ভাই-বোন মিলে গঠিত পরিবার। আর যৌথ পরিবারে মা-বাবা, ভাই-বোন, দাদা-দাদি, চাচা-চাচি, ফুফু ইত্যাদি সহ আরো অনেক সদস্য থাকেন (সদস্য সংখ্যা কম-বেশি হতে পারে)।

মুসলিম পারিবারিক কাঠামোর কিছু দিক তুলে ধরা হলো:-

বিয়ে

মানব জীবনে বিয়ে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি অধ্যায়। বিয়ে দ্বারা ঈমানের পূর্ণতা লাভ হয়, দ্বীনের অর্ধেক পরিপূর্ণ হয়। শারীরিক, মানসিক চাহিদাসহ, অন্তরের ওয়াসওয়াসা ও অবৈধ কামনা থেকে নিজেকে সংযত করা যায়। বিয়ের মাধ্যমে অন্তরে প্রশান্তি আসে, রিজিকে বারাকাহ আসে। এ বিষয়ে আল্লাহ তা'লা বলেন,

وَمِنۡ اٰيٰتِهٖۤ اَنۡ خَلَقَ لَكُمۡ مِّنۡ اَنۡفُسِكُمۡ اَزۡوَاجًا لِّتَسۡكُنُوۡۤا اِلَيۡهَا وَجَعَلَ بَيۡنَكُمۡ مَّوَدَّةً وَّرَحۡمَةً ؕ اِنَّ فِىۡ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوۡمٍ يَّتَفَكَّرُوۡنَ

অর্থ : আর এক নিদর্শন এই যে, তিনি তোমাদের জন্যে তোমাদের মধ্য থেকে তোমাদের সংগিনীদের সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা তাদের কাছে শান্তিতে থাক এবং তিনি তোমাদের মধ্যে পারস্পরিক সম্প্রীতি ও দয়া সৃষ্টি করেছেন। নিশ্চয় এতে চিন্তাশীল লোকদের জন্যে নিদর্শনাবলী রয়েছে। [২]

আল্লাহ তা'লা আরো বলেন,

وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّنْ قَبْلِکَ وَجَعَلْنَا لَہُمْ اَزْوَاجًا وَّذُرِّیَّۃً

অর্থ : আপনার পূর্বে আমি অনেক রসূল প্রেরণ করেছি এবং তাঁদেরকে পত্নী ও সন্তান-সন্ততি দিয়েছি। [৩]

বিয়ে নবী-রাসুলদের সুন্নাহ। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজে বিয়ে করেছেন এবং এর প্রতি উদ্বুদ্ধ করতে গিয়ে বলেছেন,

"বিবাহ আমার সুন্নাহ। অতএব যে আমার সুন্নাহ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে, সে আমার দলভুক্ত নয়।" [৪]

একজন মুমিনের জন্য বিয়ে খুব গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত ও দায়িত্ব। বিয়ের মাধ্যমে সন্তান, বংশ ও মুসলিমদের সংখ্যা বৃদ্ধির মাধ্যমে ইবাদাত বৃদ্ধি হয়। হাদিস শরীফে বর্ণিত হয়েছে,

"তোমরা কুমারী ও অধিক সন্তান জন্মদানে সক্ষম নারীদের বিয়ে কর। কেননা কেয়ামতের দিন আমি আমার উম্মতের সব পর্ব করব।" [৫]

বিয়ার রুকন ২টি যথা :-

১. ইজাব (প্রস্তাব)

২. কবুল (গ্রহণ)

আর এক্ষত্রে ক্ষেত্রে বর-কনে উভয়ের সম্মতি থাকা শর্ত। কারো মতের বিরুদ্ধে গিয়ে বিবাহ কার্যসম্পাদন করা যাবে না।

মোহর ও কুফু

আরবি 'কুফু' শব্দের অর্থ সমতা, সমান, সাদৃশ্য ইত্যাদি।

ইসলামী পরিভাষায় বিয়ের ক্ষেত্রে বর-কনের রুচি, চাহিদা, বংশ, যোগ্যতা সবকিছু সমান সমান বা কাছাকাছি হওয়াকে কুফু বলে।

দ্বীনদার পাত্র-পাত্রীর সঙ্গে একজন সাধারণ (দ্বীনের বুঝ নাই বা কম) পাত্র-পাত্রীর জীবন আচরণ মিলবে না। তাদের মতার্দশ, চিন্তাধারায় পার্থক্য থাকবে। একজন দ্বীনের আলোকে সবকিছু দেখবে আর আরেকজন দেখবে দুনিয়াবী চাহিদায়। এতে দাম্পত্য জীবনে অশান্তি

হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। আবার এলিট বা উচ্চ শ্রেণীর ছেলে-মেয়েদের চাহিদা, রুচির সাথে একজন দরিদ্র বা মধ্যবিত্ত পরিবারের ছেলে-মেয়েদের রুচিবোধের মিল থাকবে না।
সুতরাং এই দুই ক্ষেত্রে দাম্পত্য জীবনে সুখ-শান্তির বদলে অশান্তি হতে দিতে পারে। তাই পবিত্র কুরআনে বিয়ের ক্ষেত্রে দ্বীনদারিতা ও সমতা রক্ষার বিষয়ে গুরুত্বারোপ আরোপ করা হয়েছে।
আল্লাহ বলেন,
"দুশ্চরিত্রা নারী দুশ্চরিত্র পুরুষের জন্য; দুশ্চরিত্র পুরুষ দুশ্চরিত্রা নারীর জন্য; সচ্চরিত্রা নারী সচ্চচরিত্র পুরুষের জন্য এবং সচ্চচরিত্র পুরুষ সচ্চরিত্রা নারীর জন্য।" [৬]

অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন,
"ব্যাভিচারী পুরুষ যেন ব্যাভিচারিণী বা মুশরিক নারী ছাড়া কাউকে বিয়ে না করে। আবার ব্যাভিচারিণী নারী যেন ব্যাভিচারী পুরুষ বা মুশরিক পুরুষ ছাড়া কাউকে বিয়ে না করে। মুমিনদের জন্য এ ধরনের চরিত্রের নারী-পুরুষকে হারাম করা হয়েছে।" [৭]

মোহর স্ত্রীর হক। বিয়ের সময় স্ত্রীকে দেনমোহর প্রদান করার স্বামীর উপর ফরজ (কোথাও আবার ওয়াজিব বলা হয়েছে)। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'লা ইরশাদ করেন,
"তোমরা খুশি মনে স্ত্রীকে মোহর পরিশোদ করো। তারা যদি খুশি হয়ে তা থেকে অংশ ছেড়ে দেয়, তবে তা তোমরা স্বাচ্ছন্দ্যে ভোগ করো।" [৮]
মোহর প্রধানের মাধ্যমে স্ত্রীকে সম্মানিত করা হয়। জাহেলী যুগে নারীদেরকে কোন সম্পদ দেওয়া হতো না। মোহরের বিধান প্রবর্তনের মাধ্যমে নারীদেরকে সম্পদের মালিকানা প্রদান করা হয়।
স্ত্রীকে মোহর সম্পূর্ণ বা আংশিক পরিশোধ না করলে স্বামীর উপর ঋণ হয়ে থাকবে।
মোহর ২টি পর্যায়ে পরিশোধ করা যায় :-
১. নগদ
২. বাকি
বিবাহে পুরো মোহর না পারলে কিছু অংশ নগদে পরিশোধ করা উত্তম।
রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,
"লোহার আংটি দিয়ে হলেও বিয়ে করো।" [৯]
বিবাহের সর্বনিম্ন মোহর দশ দিহরাম। হযরত ফাতেমা (রাঃ) ও হযরত আলী (রাঃ) তা'আলা এর বিয়ের সময় যে মোহর নির্ধারিত ছিলো, সেটা 'মোহরে ফাতেমি' হিসাবে পরিচিত। আর মোহরের ফাতেমী হলো ৫০০ দিরহাম। অনেক মনে করেন মোহরে ফাতেমি সুন্নত, আসলে

তা ঠিক নয়। কেননা মোহরে ফাতেমী যদি সুন্নত হতো তাহলে সাহাবাগণ মোহরে ফাতেমি এর চেয়ে কম-বেশি মোহর ধার্য করে বিয়ে করতেন না। বরং সামর্থ্য অনুযায়ী মোহর ধার্য করা সুন্নত।

স্বামী-স্ত্রীর হক

দাম্পত্য জীবন আল্লাহ তা'লার পক্ষ থেকে অনেক বড় ও বিশেষ একটি নিয়ামত। স্বামী-স্ত্রীর উভয়ের উপর একে অপরের হক রয়েছে। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَاَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ

অর্থ : তারা (স্ত্রীগণ) তোমাদের পোশাক এবং তোমরা (স্বামীগণ) তাদের পোশাকস্বরুপ। [১০]
উপরোক্ত আয়াতে আল্লাহ তা'লা স্বামী-স্ত্রী দুজনকে একে অপরের প্রতিপক্ষ না করে, একে অপরের পোশাকস্বরুপ বলেছেন। দুজনের সম্মান ও গুরুত্ব তুলে ধরেছেন। পারস্পরিক ভালোবাসা ও সৌহার্দ্যপূর্ণ এই বন্ধনটি শুধু দুনিয়ার জন্য, বরং এটা জান্নাতের জন্য। স্বামী স্ত্রীর সম্পর্ক জান্নাতি বন্ধন। এতে দুজনের আলাদা কিছু দায়িত্ব, কর্তব্য ও হক রয়েছে,

স্বামীর দায়িত্ব সম্পর্কে আল্লাহ তা'লা বলেন,
"পুরুষেরা নারীর উপর কর্তৃত্বশীল এজন্য যে আল্লাহ একের উপর অন্যের বৈশিষ্ট্য দান করেছেন এবং এজন্য যে তারা তাদের অর্থ ব্যয় করে।" [১১]
স্বামীর প্রথম দায়িত্ব হলো স্ত্রীর মোহর পরিশোধ করা। তারপর দায়িত্ব হলো, স্ত্রীকে খাদ্য, পোশাক ও বাসস্থান দেওয়া। স্ত্রীর সাথে ভালো আচরণ করা, তার মতামতের গুরুত্ব দেওয়া, প্রশংসা করা, তার প্রয়োজনীয় বিষয়গুলো খেয়াল রাখা, তার পরিবার পরিজনের খবর নেওয়া সহ আরো অনেক দায়িত্ব - কর্তব্য রয়েছে। বিদায় হজের ভাষণেও রাসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নারীদের ব্যাপারে বলেছেন,

اتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ

অর্থ : “তোমরা নারীদের বিষয়ে আল্লাহকে ভয় কর।” [১২]
আয়াতের মাধ্যমে নারীদের সাথে সদাচারণ ও তাদের হক
যথাযথভাবে আদায় করার বিষয়টা ফুটে উঠে। উত্তম মানুষের উদাহরণ দিতে গিয়েও রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরো বলেছেন, সেই ব্যক্তি সর্বাধিক উত্তম, যে তার পরিবারের কাছে উত্তম।
অন্যদিকে, নারীদেরকেও স্বামীর আনুগত্যে করতে বলা হয়েছে। হাদিসে আছে,

“নারী যখন পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ ঠিকভাবে আদায় করবে, রমজানের রোজা রাখবে, নিজের লজ্জাস্থানের হেফাজত করবে এবং স্বামীর আনুগত্য করবে—তখন সে জান্নাতের যেকোনো দরজা দিয়ে প্রবেশ করতে পারবে।” [১৩]

বিয়ের পর, স্বামীই স্ত্রীর অবিভাবক। মৌলিকভাবে স্ত্রীর দায়িত্ব ৩টি :-

১. গুনাহের কাজ নয় এমন বিষয়ে স্বামীর আনুগত্য করা।

২. স্বামীর অবর্তমানে নিজের সৌন্দর্য্য পর পুরুষের সামনে প্রকাশ না করা এবং নিজের পবিত্রতা রক্ষা করা।

৩. স্বামীর সম্পদের হেফাজত করা।

এছাড়াও স্বামীর খিদমত করা, তার মনে কষ্ট না দেওয়া, তার অনুমতি ছাড়া নফল রোজা না রাখা, তাকে ছাড়া একাকী সফরে না যাওয়া সহ আরো অনেক বিষয়ের দিকে স্ত্রীর খেয়াল রাখা উচিত।

তালাক

তালাক শব্দের অর্থ বিচ্ছেদ বা ত্যাগ করা, বন্ধন মুক্ত করা, ছেড়ে দেওয়া।

ইসলাম ধর্মে শরয়ী বিবাহ বিচ্ছেদকে তালাক বলা হয়। জায়েজ বা বৈধ কাজের মধ্যে আল্লাহ তা'লার নিকট সবচেয়ে অপছন্দনীয় কাজ হচ্ছে তালাক।

তালাক শুধু স্বামী দিতে পারেন, স্ত্রী পারবে না। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে যখন অনেক অশান্তি দেখা যায়, একে অপরের সাথে বনিবনা একদমই হয়না তখন তালাক দেওয়া যায়। তবে, ইসলাম কখনো তালাক এর প্রতি কাউকে উদ্বুদ্ধ বা জোর করেনা;। এটা স্বামী-স্ত্রীর একদম ব্যক্তিগত বিষয়। কেউ যেনে বুঝে তালাক দেয় আবার কেউ রাগের মাথায় না বুঝে তালাক দেয়। এজন্য বিয়ের সময় বা আগে তালাক এর সমস্ত মাসলা-মাসায়েল জেনে নেওয়া উচিত।

পিতা-মাতার হক

বান্দার হকের মধ্যে সবার উপরে হচ্ছে পিতা–মাতার হক। আল্লাহ তা'লা মায়ের পায়ের নিচে সন্তানের বেহেশত এবং বাবাকে জান্নাতের দরজা হিসাবে উল্লেখ করেছেন। ইসলাম ধর্মে পিতা-মাতার মর্যাদা অনেক বেশি।

সন্তান পিতা–মাতার সাথে ভালো ব্যবহার করবে এবং তাদেরকে কষ্ট দিবেনা। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন, "আর আমি নির্দেশ দিয়েছি মানুষকে, তার পিতা–মাতার সঙ্গে ভালো ব্যবহার করার।" [১৪]

অন্য আয়াতে আল্লাহ তা'লা বলেছেন,

"তোমরা আল্লাহর ইবাদত করো, তাঁর সঙ্গে শরিক করো না এবং পিতা–মাতার সঙ্গে সদ্ব্যবহার করো।" [১৫]

পিতা-মাতার হকসমূহ হলো :-

১. পিতা-মাতার সাথে ভালো ব্যবহার করা।

২. তাদেরকে কষ্ট না দেওয়া।

৩. তাদের আদেশ মেনে চলা, যতক্ষণ না তা আল্লাহর অবাধ্যতার মধ্যে পড়ে।

৪. তাদের জন্য দো'আ করা —

رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِى صَغِيْرًا

অর্থ : "হে আমার রব! তাঁদের প্রতি দয়া কর যেমন তাঁরা শৈশবে আমাকে লালন-পালন করেছেন।" (সূরা ইসরা ১৭:২৪)

৫. অসুস্থ হলে সেবা করা।

৬. তাদের জরুরতের বিষয়গুলো খেয়াল রাখা।

৭. বার্ধক্য বয়সে তাদের সাথে আরো কোমল আচরণ করা।

৮. মৃত্যুর পর দোয়া করা এবং ঈসালে সওয়াবের ব্যবস্থা করা।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রা.) হতে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন- "পিতার সন্তুষ্টিতে আল্লাহর সন্তুষ্টি এবং পিতার অসন্তুষ্টিতে আল্লাহ অসন্তুষ্টি।" [১৬]
হযরত আবু বাকরাহ রাযি. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন- রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা ইচ্ছে করলে বান্দার সকল প্রকার গুনাহ মাফ করে দিতে পারেন, কিন্তু মাতা-পিতার অবাধ্যতার গুনাহ তিনি মাফ করবেন না। আর অবাধ্য সন্তানের সাজা তার মৃত্যুর পূর্বে এই দুনিয়াতেও হবে। [১৭]
পিতা-মাতার হকের সাথে সন্তানের দুনিয়া-আখিরাতে জড়িত। হাদিসে, মায়ের পায়ের নিচে সন্তানের বেহেশতে এবং বাবাকে জান্নাতের দরজা হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে। অতএব, তাদের হক যথাযথভাবে আদায় না করলে চরম ভোগান্তি আছো ইহকাল ও পরকালে। আর হক যথাযথ আদায় করলে, আল্লাহ তা'লা ইহকাল ও পরকালে পুরস্কৃত করবেন।

সন্তানের হক

সন্তান তার মা-বাবার কাছে আমানত। এই আমানতের মালিক আল্লাহ সুবাহান তা'লা এবং তিনি যাকে খুশী তাকে তা দান করেন। ইসলামে পিতা-মাতার যেমন হক রয়েছে, সন্তানেরও

তেমনি হক রয়েছে। সন্তানের হক আদায় না করলে আল্লাহ তা'লার কাছে জবাবদিহি করতে হবে।

আবদুল্লাহ ইবনু উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত যে, রাসুলল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

"জেনে রেখো! তোমাদের প্রত্যেকেই একজন দায়িত্বশীল; আর তোমরা প্রত্যেকেই নিজ অধীনস্থদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। অতএব ইমাম, যিনি জনগণের দায়িত্বশীল তিনি তার অধীনস্থদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবেন। পুরুষ গৃহকর্তা তার পরিবারের দায়িত্বশীল; সে তার অধীনস্থদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। নারী তার স্বামীর পরিবার, সন্তান-সন্ততির উপর দায়িত্বশীল, সে এসব সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। কোন ব্যাক্তির দাস স্বীয় মালিকের সম্পদের দায়িত্বশীল; সে এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। অতএব জেনে রাখ, প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল এবং তোমাদের প্রত্যেকেই নিজ নিজ দায়িত্বাধীন বিষয় সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে।" [১৮]

সন্তানের হক সমূহ হলো :-

১. জন্মের পর কানে আযান দেওয়া।

২. সুন্দর নাম রাখা।

৩. আক্বিকা করা।

৪. ছেলে সন্তানের খাতনা করা।

৫. আদব কায়দা সহ উত্তম আখলাক শিখানো।

৬. কুরআন তেলাওয়াত শিখানো।

৭. নামাজ পড়া শিখানো এবং নামাজ পড়াতে অভ্যস্ত করা

৮. দ্বীনি ইলম শিক্ষা দেয়া।

৯. উপযুক্ত সময়ে সুন্নাহ সম্মতভাবে বিবাহের ব্যবস্থা করা।

১০. পাপকাজ, বেহায়াপনা ও অপসংস্কৃতি থেকে বিরত রাখা। গুনাহের কাজ থেকে বিরত না রাখলে এই সন্তানগনই কিয়ামাতের দিন পিতা-মাতার বিরুদ্ধে দাঁড়াবে।

ইমাম ইবনে জারীর তবারী (রাহ.) বলেন, আল্লাহ তা'আলা মুমিন বান্দাদের লক্ষ করে বলছেন,

"হে মুমিনগণ! জেনে রেখ, তোমাদেরকে যে ধন-সম্পদ ও সন্তানাদি দান করেছি এসব তোমাদের জন্য পরীক্ষার বস্তু। এর মাধ্যমে তোমাদের আমি পরীক্ষা করব। এটা দেখার জন্য যে, সন্তান-সন্ততি ও অর্থ-কড়ির ক্ষেত্রে তোমরা আল্লাহর হক কতটুকু আদায় কর এবং দ্বীনের বিধিনিষেধ কী পরিমাণ মান্য কর।" [১৯]

মীরাস বা উত্তরাধিকার সম্পদ

জাহেলী যুগে নারী ও ইয়াতীম ছেলে-মেয়ে উত্তরাধিকার সম্পদের কোনো ভাগ পেতো না। পুত্র সন্তানও অপ্রাপ্ত বয়স্ক হলে, সে ও সম্পদের ভাগ পেতো না। ইসলাম আসার পর, সমাজে ন্যায় প্রতিষ্ঠা হয়। নারী-পুরুষ, ইয়াতিমসহ প্রত্যেকে তার নির্ধারিত হক পায়।

ব্যক্তি জীবিত অবস্থায় ওয়ারিশদের মাঝে সম্পত্তি দিলে সেটাকে হেবা বলে। আর মারা যাওয়ার পর মৃত ব্যক্তির সম্পত্তির ভাগকে মিরাস বলে।

ব্যক্তি জীবিত অবস্থায় তার সম্পদের মালিক সে নিজে। এতে কেউ হক বা দাবিদার থাকে না। কিন্তু মারা যাওয়ার পর শরয়ী নীতিমালা অনুপাতে তার সম্পদ বন্টন করতে হয়। মারা যাওয়ার পর তার ঋণ শোধ(যদি ঋণ থাকে), ওসিয়ত পূরণ ও কাফন দাফনের খরচ বাদ দিয়ে, বাকি সম্পদগুলো কুরআন-হাদীসের আলোকে ওয়ারিসদের মধ্যে বন্টন করা ফরজ।

আল্লাহ তা'লা পবিত্র কুরআনে বলেছেন,

আল্লাহ তোমাদেরকে তোমাদের সন্তানদের সম্পর্কে নির্দেশ দিচ্ছেন, এক ছেলের জন্য দুই মেয়ের অংশের সমপরিমাণ। তবে যদি তারা দুইয়ের অধিক মেয়ে হয়, তাহলে তাদের জন্য হবে, যা সে রেখে গেছে তার তিন ভাগের দুই ভাগ; আর যদি একজন মেয়ে হয় তখন তার জন্য অর্ধেক। আর তার মাতা পিতা উভয়ের প্রত্যেকের জন্য ছয় ভাগের এক ভাগ সে যা রেখে গেছে তা থেকে, যদি তার সন্তান থাকে। আর যদি তার সন্তান না থাকে এবং তার ওয়ারিছ হয় তার মাতা পিতা তখন তার মাতার জন্য তিন ভাগের এক ভাগ। আর যদি তার ভাই-বোন থাকে তবে তার মায়ের জন্য ছয় ভাগের এক ভাগ। অসিয়ত পালনের পর, যা দ্বারা সে অসিয়ত করেছে অথবা ঋণ পরিশোধের পর। তোমাদের মাতা পিতা ও তোমাদের সন্তান-সন্ততিদের মধ্য থেকে তোমাদের উপকারে কে অধিক নিকটবর্তী তা তোমরা জান না। আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারিত। নিশ্চয় আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। [২০]

»» তাফসীরে ইবনে কাসীর মুতাবেক আয়াতটির ভাবার্থ হচ্ছে-

“আল্লাহ তা'আলা তোমাদের সন্তানদের ব্যাপারে ন্যায় প্রতিষ্ঠার কথা শিক্ষা দিচ্ছেন। অজ্ঞতার যুগে লোকেরা তাদের সমস্ত মাল ছেলেদেরই শুধু প্রদান করতো এবং মেয়েদেরকে সম্পূর্ণরূপে বঞ্চিত করতো। তাই আল্লাহ তা'আলা মেয়েদের জন্যে অংশ নির্ধারণ করেন। তবে তাদের মধ্যে পার্থক্য রেখেছেন। কেননা, যতগুলো কর্তব্য পালন পুরুষদের দায়িত্বে রয়েছে। ততটা স্ত্রীদের দায়িত্বে নেই। যেমন পরিবারের খাওয়া পরার জন্যে আয় ব্যয়ের। দায়িত্ব, ব্যবসা-বাণিজ্য এবং অনুরূপভাবে অন্যান্য বহু কষ্ট তাদেরকে সহ্য করতে হয়। এ জন্যেই তাদের প্রয়োজন অনুপাতে তাদেরকে স্ত্রীদের দ্বিগুণ প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

কোন কোন বিজ্ঞ মনীষী এখানে একটি সূক্ষ্ম তত্ত্ব বের করেছেন যে, আল্লাহ তা'আলা স্বীয় বান্দাদের উপর পিতা-মাতা হতেও বহু গুণে দয়ালু ও স্নেহশীল। পিতা-মাতাকে তিনি তাদের

সন্তানদের ব্যাপারে অসিয়ত করছেন। সুতরাং জানা যাচ্ছে যে, আমাদের সৃষ্টিকর্তা করুণাময় আল্লাহ তার সৃষ্টজীবের উপর যত বেশী দয়াবান তত দয়াবান বাপ মা তাদের সন্তানদের প্রতি নয়। যেমন সহীহ হাদীসে রয়েছে যে, বন্দীদের মধ্য হতে একটি শিশু তার মা হতে পৃথক হয়ে পড়ে। মা তার শিশুর খোজে পাগলিনীর ন্যায় ছুটাছুটি করে এবং যে শিশুকেই পায় তাকেই বুকে জড়িয়ে ধরে দুধ পান করিয়ে দেয়। এ দৃশ্য দেখে রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁর সাহাবীগণকে বলেনঃ "আচ্ছা বলতো, অধিকার থাকা সত্ত্বেও কি এ স্ত্রী লোকটি তার শিশুটিকে আগুনে নিক্ষেপ করতে পারে? সাহাবীগণ উত্তরে বলেনঃ হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! কখনই না!" তিনি তখন বলেনঃ "আল্লাহর শপথ! আল্লাহ তাআলা স্বীয় বান্দাদের উপর এর চেয়েও বেশী দয়ালু।"

একটা মেয়ে সন্তান জন্ম হওয়ার পর থেকে, তার দায়িত্ব থাকে পিতার উপর। পিতা তার ভরণ-পোষণের সবকিছু করবে। পিতা না থাকলে ভাই; আর ভাই না থাকলে অন্য মাহরাম পুরুষ(দাদা,চাচা,মামা) তার দায়িত্ব পালন করবে। বিয়ের পর স্বামী, আর স্বামীর পর ছেলে সে দায়িত্ব পালন করবে। নারীদের উপর আলাদাভাবে নিজের বা অন্যকারো আর্থিক খরচ করার দায়িত্ব নেই। কিন্তু পুরুষের উপর তার মা-বাবা, স্ত্রী-সন্তানসহ আরো যে যে সদস্য পরিবারে থাকেন, তাদের সবদিকটা খেয়াল রাখতে হয়। ভরণ-পোষণ চালিয়ে যেতো হয়। এজন্য মীরাস বা উত্তরাধিকার সম্পদে পুরুষের অংশ বেশি রাখা হয়, আর মেয়েদের একটু কম। মেয়েরা মীরাসে বা বিয়ের মোহরে যে অংশ পায়, সেটা একান্ত তার ব্যক্তিগত সম্পদ ; এখানে অন্য কারো হস্তক্ষেপ নেই। নারী-পুরুষের উত্তরাধিকার সম্পদের পার্থক্যের হিকমতই এটা।

অধ্যায় ৩

পশ্চিমা পারিবারিক কাঠামো

মুসলিম পারিবারিক কাঠামো যেখানে ধর্মীয় মূল্যবোধের সাথে সাথে একে অপরের প্রতি ভালোবাসা, দায়িত্ব-কর্তব্য ও ইনসাফের ভিত্তিতে সম্পর্ক গড়ে উঠে; সেখানে পশ্চিমা পারিবারিক কাঠামো গড়ে উঠে ব্যক্তিস্বাধীনতা আর সমতার উপর ভিত্তি করে। ব্যক্তিস্বাধীনতা শুধুমাত্র 'নিজেকে' কেন্দ্র করে, এখানে শুধু 'নিজের চাওয়া পাওয়া আর চাহিদাকে' মূল্যায়ন করা হয়। অপর ব্যক্তির চাওয়া-পাওয়া একদমই খেয়াল করা হয়না। পশ্চিমা পারিবারিক কাঠামোতে ধর্মীয় মূল্যবোধ একদমই দুর্বল। আর পরিবারের মধ্যে ভালোবাসা, দায়িত্ব-কর্তব্য বিলুপ্তির পথে।

পশ্চিমাতে বেশির ভাগ একক পরিবার দেখা যায়। যেখানে স্বামী-স্ত্রী আর ছেলে-মেয়ে থাকেন। আবার অনেক পরিবারে দেখা যায়, শুধু মা আর ছেলে-মেয়ে। সিঙ্গেল মায়ের কনসেপ্টটা খুব বেশি, কারণ মা-বাবার মধ্যে ডিভোর্স হয়ে যায়। আর তারা বিয়ের চেয়ে বিয়ে ছাড়া থাকাতে অর্থ্যাৎ লিভ টুগেদারে বেশি স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করে। দাম্পত্য সম্পর্কের কাঠামো খুবই দুর্বল।
বয়স্ক পিতা-মাতাকে বৃদ্ধাশ্রমে দিয়ে দেওয়া হয়।
পশ্চিমা পারিবারিক কাঠামোর কিছু দিক তুলে ধরা হলো :-

বিয়ে

পশ্চিমা সমাজে বিয়ের সিদ্ধান্ত সাধারণত ব্যক্তিগত পছন্দের উপর নির্ভর করে। এখানে পিতামাতা বা পরিবারের ভূমিকাকে তেমন গুরুত্ব দেওয়া হয় না; বরং ছেলে-মেয়েরা একটু বয়স হয়ে গেলে অর্থ্যাৎ ৩০–৩৫ বছর বয়সে নিজের উপযুক্ত সঙ্গী নির্বাচন করে।

বিয়েকে স্থায়ী বন্ধনের বদলে একটি চুক্তি হিসেবে দেখা হয়। পছন্দের উপর ভিত্তি করে সম্পর্ক শুরু হয়, আর কিছুদিন পর অপছন্দ হলে আবার ডিভোর্সও দিয়ে দেওয়া হয় সহজে। তাদের কাছে বিয়ে ব্যক্তিগত স্বাধীনতা ও উপভোগের মাধ্যম; কোনো পবিত্র আমানত বা পারিবারিক দায়িত্ব নয়।

সাম্প্রতিক সময়ে নারীবাদী আন্দোলন ও

ক্রমবর্ধমান সামাজিক উদারতার প্রভাবে ‘সমকামী বিয়ে’ পশ্চিমা সমাজে স্বীকৃতি পেয়েছে। সমকামী বিয়ে বলতে বুঝায়, মেয়ে মেয়েকে আর ছেলে ছেলেকে বিয়ে করা। সমকামী বিয়ে মুসলিম বিশ্বের জন্য ভয়াবহ ফিতনা।

তালাক বা ডিভোর্স

পশ্চিমা দেশগুলোতে তালাক এর হার অনেক বেশি। আমেরিকায় ৫০% বিয়ের শেষ পররিণতি হয় তালাকে। বেশিরভাগ শিশু মা-বাবার তালাক দেখে। আর এই তালাক নারীদের পক্ষ থেকে বেশি চাওয়া হয়। তালাকের পর স্বামীর উপার্জিত অর্থ-সম্পদের অর্ধেক অনায়াসে স্ত্রী পেয়ে যান।

বিগত কয়েক দশকে পশ্চিমা বিশ্বে, বিশেষত আমেরিকায় নারীদের মাথাপিছু সম্পদের পরিমাণ দ্রুতহারে বেড়ে যাওয়ার প্রধান মাধ্যম হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে তালাক। রাষ্ট্রীয়ভাবে, তালাক এর পর স্বামী তার অর্ধেক অর্থ-সম্পদ স্ত্রীকে দিতে বাধ্য। যদি কেউ না দেয়, তাহলে তার বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া যায়।

পশ্চিমা সমাজের সিংহভাগ মানুষের জীবনযাত্রার সাথে তাদের ধর্মের দূরত্ব অনেক। বিয়ের মতো সুন্দর একটা সম্পর্ককে তারা একদম ঠুনকো করে দিয়েছে। নিজেদের মতামত বা যেকোনো কিছুর মধ্যে একটু অমিল হলেই তালাক দিয়ে দেয়। বাচ্চা থাকলে, বাচ্চারও চিন্তা করেনা। তাদের কাছে ভালোবাসা কিংবা অপরজনকে গুরুত্ব দেওয়ার চেয়ে নিজের ইগো বা ব্যক্তি-স্বাধীনতা প্রকাশ করা বেশি জরুরী; আর এসব প্রকাশ করতে গিয়ে, তালাকের মহামারী ভয়াবহ আকারে পশ্চিমা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছে।

লিভ টুগেদার

নারী-পুরুষ বিয়ে না করে স্বামী-স্ত্রীর মতো একসাথে বসবাস করাকে লিভ টুগেদার বলে। এর কোনো সময়সীমা নেই। বিয়েও করতে হয় না, আবার তালাকও দিতে হয়না। শুধুমাত্র দু'জনের আবেগ-অনুভূতির বশবর্তী হয়ে যতোদিন ইচ্ছা ততোদিন একসাথে একই বাসায় থাকা যায়। এর কোনো দায়বদ্ধতা নাই, জবাবদিহিতা নাই।

'লিভ টুগেদার' বা 'লিভ ইন রিলেশনশিপ' নামে এটা বেশ পরিচিত। বিবাহবর্হির্ভূত এই জঘন্য সম্পর্ককে নরমালাইজ করার জন্য পশ্চিমা বিশ্ব বেশ তৎপর।

পিতা-মাতা ও সন্তানের সম্পর্ক

পশ্চিমা সমাজে পারিবারিক বন্ধন গড়ে উঠেছে ব্যক্তিকেন্দ্রিক। 'গিভ এন্ড টেইক' টাইপ সম্পর্ক; সেটা পিতা-মাতার মধ্যে হোক কিংবা সন্তানদের মধ্যে। ইহসান নামের শব্দটা তাদের ডিকশনারীতে নেই।

ছোটবেলা থেকে বাচ্চাকে স্বাধীনভাবে বাঁচতে শিখানো হয়। ক্যারিয়ার বা জীবনে উন্নতির পিছনে এতো বেশি ফোকাস করানো হয় যে, তারা নিজের মা-বাবা কিংবা ভাই-বোনদের হক আদায়ের বিষয়ে সচেষ্ট হয় না। অবশ্য সন্তানের চেয়ে মা-বাবার কাছেও ক্যারিয়ার বেশি গুরুত্বপূর্ণ। যার ফলে, সন্তান প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়ার পর সন্তানের উপর আর মা-বাবার কোনো অধিকার থাকে না। সন্তান নিজ ইচ্ছা-মতো জীবন অতিবাহিত করে। সন্তানের মতের বিরুদ্ধে গেলে, মা-বাবার বিরুদ্ধে আইনী ব্যবস্থাও নেওয়া যায়। ফলে, কারো উপর কারো অধিকার বা হক থাকে না।

বয়স্ক মা-বাবাকে বৃদ্ধাশ্রমে দিয়ে দেওয়ার সিস্টেমটা খুব চালু। আবার হঠাৎ কেউ দেখাশুনা করলে সরকারের কাছ থেকে আলাদা একটা বোনাস নেয়, 'টেইক কেয়ার' এর মাসিক বেতন হিসাবে। কারণ পিতা-মাতাকে দেখাশুনা করা বা খেয়াল রাখার কনসেপ্টটা তাদের পারিবারিক কাঠামোতে নেই।

নারী-পুরুষের দায়িত্ব-কর্ত্তব্য

অতীতে পশ্চিমা পরিবার ছিলো পুরুষতান্ত্রিক। পুরুষরা উপার্জন করতো আর নারীরা ঘরোয়া কাজ করতো। সভ্যতার উন্নতি আর শিল্পবিপ্লবের ফলে এই চিত্র বদলে গেছে। সময়ের সাথে পশ্চিমা পারিবারিক কাঠামোতে নারী-পুরুষের ভূমিকা পরিবর্তিত হয়েছে। নারী-পুরুষ সমান অধিকারে তারা অভ্যস্ত হয়েছে। পুরুষ যেমন বাইরে উপার্জন কিংবা চাকরী করবে; নারীও তাই করবে। নারী যেমন ঘরোয়া কাজ করবে; পুরুষও তেমনি ঘরোয়া কাজ করবে। নারীর রান্না-বান্না, সন্তান লালন পালনসহ সকল কাজে সমান অংশ পুরুষ নিবে। আবার পুরুষ যেমন স্বাধীনভাবে চলাফেরা করবে, নারীও তেমন করবে। পরিবারের খরচে দু'জনের থাকবে সমান ব্যয়।

সমতা বা সমান অধিকারের টার্মটা পশ্চিমা পারিবারিক, সামাজিকসহ, রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রেও চালু হয়েছে। নারী-পুরুষ কেউ কারো চেয়ে কম নয়, তাই নিজেদের মধ্যে চলে এক প্রতিযোগিতা। ব্যক্তিস্বাধীনতার ফলে এই প্রতিযোগিতা অনেক সময় দ্বন্দের রূপ নেয়। কারণ, শারীরিক বা মানসিকভাবে নারী-পুরুষ কখনো সমান নয়; অনেক পার্থক্য আছে। এই অসুস্থ

প্রতিযোগীতার ফলে পশ্চিমা দেশগুলোতে একাকীত্ব বেড়ে গেছে। নারী-পুরুষের দাম্পত্য জীবন রূপ নিয়েছে বিবাহ বিচ্ছেদে। আর বয়স্ক পিতা-মাতার আশ্রয় হয়েছে বৃদ্ধাশ্রমে।

অধ্যায় ৪

মুসলিম উম্মাহ ও পশ্চিমা আধিপত্য

ইতিহাসে খিলাফাহর পতন, উপনিবেশবাদ এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মতো ঘটনাগুলো মুসলিম উম্মাহর রাজনৈতিক, সামাজিক ও পারিবারিক কাঠামোর ওপর গভীর প্রভাব ফেলেছে।খিলাফাহর পতনের ফলে মুসলিমদের ঐক্য ভেঙে যায় এবং নেতৃত্বশূন্যতা দেখা দেয়। উপনিবেশবাদের মাধ্যম দেশগুলো অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল হয়ে পড়ে। আর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর পশ্চিমা শক্তিগুলো আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করে এবং আধুনিক শিক্ষা, মিডিয়া ও সামাজিক মূল্যবোধের মাধ্যমে মুসলিম সমাজে ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করে।
এই গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার প্রভাবসমূহ বিস্তারিতভাবে বিশ্লেষণ করা হলো:-

খিলাফাহর পতন
খিলাফাহ হলো একটি ইসলামিক শাসন ব্যবস্থা বা রাষ্ট্র, যেখানে একজন "খলিফা" ইসলামি আইন অনুযায়ী মুসলিম উম্মাহকে নেতৃত্ব দেন।
হযরত মুহাম্মদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মৃত্যুর পর রাষ্ট্র পরিচালিত হতো খিলাফতের মাধ্যমে। হযরত আবু বকর (রাঃ) প্রথম খলিফা নির্বাচিত হওয়ার মাধ্যমে খিলাফত ব্যবস্থা শুরু হয়। তারপর উমাইয়া, আব্বাসীয় এবং উসমানী খেলাফত ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

খিলাফতের পতন বলতে **উসমানীয় খিলাফতের** বিলুপ্তিকেই বোঝানো হয়। উসমানী খেলাফতের কেন্দ্র ছিল তুরস্কের(তুর্কি) ইস্তাম্বুল, যা পূর্বে কনস্টান্টিনোপল নামে পরিচিত ছিল। পুরো আফ্রিকা, এশিয়া (মধ্যপ্রাচ্যের বেশি অঞ্চল) ও দক্ষিণ ইউরোপ মহাদেশে উসমনীয় খেলাফতের অধীনে ছিলো। ১৯২৪ সাল পর্যন্ত উসমানী খিলাফত টিকে ছিল। আর এই খিলাফত পতনে ইংরেজদের অর্থ্যাৎ পশ্চিমাদের হাত ছিল। তারা নিজেরা যেমন খিলাফতের বিরুদ্ধে ছিল, ঠিক তেমনি আরবদেরকে উসমানী খিলাফতের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে উস্কে দিয়েছিলো। আরবদেরকে বলতো, "তোমরা কেনো তুর্কির গোলামী করবে? তুর্কি কেনো তোমাদের শাসক হবে; তার চেয়ে বরং তোমরাই নিজেদের মধ্য থেকে শাসক

নির্বাচন করো। উসমানীদের থেকে বের হতে আমরা(পশ্চিমারা) তোমাদেরকে সাহায্য করবো"— এভাবেই নানা কলা-কৌশলে পশ্চিমারা আরবদের মনে উসমানী খিলাফাতের বিরুদ্ধে ঘৃণার বীজ তৈরি করে। তারপর যখন উসমানীদের সাথে যুদ্ধবিগ্রহ হলো তখন আর আরবদের দেওয়া হলো হিজাজ অঞ্চল। আর বাকি অঞ্চলগুলো ইউরোপের অধীনে ভাগ হয়ে গেলো। অথচ প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর, ব্রিটেন এবং ফ্রান্স গোপনে সাইকস-পিকো (Sykes-Picot Agreement) চুক্তি স্বাক্ষর করে, যার মাধ্যমে তারা প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর উসমানী সাম্রাজ্যের আরব অঞ্চলগুলো নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নেওয়ার পরিকল্পনা করেছিল।

উপনিবেশবাদ

উপনিবেশবাদ হলো উন্নত দেশের দ্বারা দুর্বল দেশের উপর রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক আধিপত্য কায়েম করার প্রক্রিয়া, যা স্থানীয় মানুষের স্বাধীনতা ও স্বার্থকে ক্ষতিগ্রস্ত করে। এখানে শাসক থাকে উন্নত শক্তিশালী দেশ, আর
দুর্বল অনুন্নত দেশটি জুলুম বা শোষণের শিকার হয়।

পশ্চিমাদের জন্য উপনিবেশবাদের সময়টা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। উপনিবেশবাদের মাধ্যমেই পশ্চিমাদের উন্নতি হয়েছিলো। ইতিহাসে দেখা যায়, ইউরোপীয় দেশগুলো (ব্রিটেন, ফ্রান্স, স্পেন, পর্তুগাল ও নেদারল্যান্ডস) দুর্বল দেশগুলোতে প্রবেশ করে তাদের সম্পদ, জনগণ এবং প্রশাসন নিজেদের শাসনের অধীনে আনতো। এই প্রক্রিয়া মূলত শুরু হয় ১৫শ শতাব্দীতে যখন পর্তুগিজ এবং স্প্যানিশ নাবিকরা সমুদ্রপথে নতুন অঞ্চল আবিষ্কার করে দখল শুরু করে। পরবর্তী শতকে ব্রিটেন এবং ফ্রান্স উপনিবেশিক শক্তি হিসেবে আবির্ভূত হয়, যা আফ্রিকা, মধ্যপ্রাচ্য ও এশিয়ার দেশগুলোকে তাদের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে নেয়।
দক্ষিণ এশিয়ায় উপনিবেশবাদ শুরু হয় বাণিজ্যের মাধ্যমে। ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি প্রথমে ব্যবসায়িক কার্যক্রম পরিচালনা করে, তারপর তারা রাজনৈতিক ক্ষমতাও দখল করতে শুরু করে। ১৭৫৭ সালে পলাশী যুদ্ধে বিজয়ী হয়ে তারা বাংলায় উপনিবেশবাদের সূচনা করে। আর এই বৃটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির উপনিবেশবাদী শাসন প্রায় ২০০ বছর চলতে থাকে।

উপনিবেশবাদের আগে মুসলমানরা শিক্ষাক্ষেত্রে ভারতের শ্রেষ্ট জাতি ছিলো। ১৭৬৫ সালে বাংলায় মাদরাসার সংখ্যা ছিল আশি হাজার। ২০০ বছর পর, ১৯৬৫ সালে এ সংখ্যা দুই হাজারের নিচে নেমে আসে। বৃটিশদের আগে আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা, অর্থনীতি সবকিছু ছিলো সমৃদ্ধ। উপনিবেশবাদের সময় তারা আমাদের ও তাদের মধ্যে একটা বাইনারি স্ট্যান্ডার্ড তৈরি

করেছে, 'যে তারা শিক্ষিত, আমরা মূর্খ; তারা সভ্য, আমরা অসভ্য'। মানে সবদিক দিয়ে তারা আমাদের চেয়ে শ্রেষ্ট এই বাইনারিটা সেট করে দিয়েছিলো মন ও মস্তিষ্কে।
মোগল আমলে ঠিক যে পরিমাণ মানুষের পেশা ছিল কৃষি, প্রায় ৪০% এর মতো মানুষের পেশা শিল্পও ছিলো। প্রধান রপ্তানিযোগ্য পন্য ছিলো - মসলিন সিল্ক কাপড়, অ্যাম্ব্রয়ডারি, পাটের গালিচা, তামা পিতলের পাত্র, গয়না, লেদার প্রোডাক্ট, পারফিউম, হাতির দাতের কারুকাজ ইত্যাদি। এই সকল পণ্য যেতো ইউরোপ-আমেরিকায় যেতো। কমমূল্যে আমাদের দেশ থেকে নিয়ে, বেশি মূল্যে তারা বিশ্বের অন্যান্য দেশে বিক্রি করতো। এভাবেই পশ্চিমারা শিল্পোন্নত ভারতবর্ষ- বাংলাকে শোষণ নিপীড়ন করে কৃষিপ্রধান দেশে পরিণত করে।

পশ্চিমের দেশগুলো বিশ্বের প্রায় **৮০%** অঞ্চলকে কোনো না কোনো সময় উপনিবেশ করেছিল।
উপনিবেশবাদের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য উদাহরণ হলো :-
• **ব্রিটিশ ভারত**: ভারত, পাকিস্তান ও বাংলাদেশ দীর্ঘ সময় ব্রিটিশদের উপনিবেশ ছিল; প্রায় ২০০ বছরের মতো
• **আফ্রিকার বিভাজন**: ইউরোপীয় শক্তিগুলো আফ্রিকার বৃহৎ অঞ্চল নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নিয়ে সেখানে উপনিবেশ স্থাপন করে।
• **ফরাসি ইন্দোচীন**: ভিয়েতনাম, লাওস ও কম্বোডিয়া এগুলোতে ফরাসি উপনিবেশ ছিল।
• **ল্যাটিন আমেরিকা**: ব্রাজিল, মেক্সিকো, পেরুসহ বহু দেশ স্পেন ও পর্তুগালের অধীন ছিল এবং তাদের ভাষা, ধর্ম ও সংস্কৃতি দ্বারা প্রভাবিত হয়।
• **ডাচ ইস্ট ইন্ডিজ**: ইন্দোনেশিয়া বহু বছর নেদারল্যান্ডসের (ডাচ) অধীনে ছিল এবং গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যকেন্দ্র হিসেবে ব্যবহৃত হত।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ **১৯৩৯** সাল থেকে **১৯৪৫** সাল পর্যন্ত সংঘটিত হয়েছিল। একপক্ষে ছিল জার্মানি, ইতালি ও জাপান, আর অপরপক্ষে ছিল ফ্রান্স, যুক্তরাজ্য, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েত ইউনিয়ন, চীন, কানাডা, ভারত (ব্রিটিশ উপনিবেশ হিসেবে), অস্ট্রেলিয়া সহ আরও কিছু দেশ। যুদ্ধ শুরু হয় **১৯৩৯** সালের **১** সেপ্টেম্বর, যখন জার্মানি পোল্যান্ডকে আক্রমণ করে। এই যুদ্ধ প্রায় ৬ বছর ধরে চলেছিল।

এটি ছিল মানব ইতিহাসের সবচেয়ে ভয়াবহ যুদ্ধ। প্রায় **৩০**টি দেশের সব মিলিয়ে **১০** কোটিরও বেশি সামরিক সদস্য অংশগ্রহণ করে যুদ্ধে। এছাড়াও বেসামরিক জনগণের উপর

চালানো নির্বিচার গণহত্যা, হলোকস্ট (হিটলার কর্তৃক ইহুদীদের উপর চালানো গণহত্যা), পৃথিবীর ইতিহাসে একমাত্র পারমাণবিক অস্ত্রের প্রয়োগ করা হয়। প্রায় ৫ কোটি থেকে সাড়ে ৮ কোটি মানুষ মৃত্যুবরণ করে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ছিলো পৃথিবীর ইতিহাসে নৃশংসতম যুদ্ধ।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর পশ্চিমা দেশগুলো তাদের শিক্ষা, আইন-কানুন, রীতি-নীতি এবং মিডিয়ার মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী নতুন মানসিকতা ছড়িয়ে দেয়। মুসলিম দেশগুলোতেও আধুনিক শিক্ষা, ইংরেজি মাধ্যম শিক্ষা চালু হয়; শিল্পকলার মাধ্যমে পশ্চিমা জীবনধারা প্রবেশ করে। যুদ্ধের সময় বিশ্বায়ন, যোগাযোগ এবং প্রযুক্তি দ্রুত বিকশিত হওয়ায় পশ্চিমা সংস্কৃতির প্রভাব আরও দ্রুত প্রসারিত হয়।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুধু একটি সামরিক সংঘাত নয়; এটি মুসলিম সমাজের রাজনৈতিক, সামাজিক ও পারিবারিক কাঠামোর ওপর দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব ফেলে। পশ্চিমাদের আধিপত্য এবং বিশ্বব্যাপী তাদের সংস্কৃতি ও মূল্যবোধের বিস্তার মুসলিম পরিবারের নৈতিক ও সামাজিক প্রথাগুলিকে পরিবর্তনের দিকে ঠেলে দেয়। এটি পরবর্তীতে মুসলিম পারিবারিক কাঠামোতে পশ্চিমা সংস্কৃতির প্রবেশের পথ সুগম করে।

অধ্যায় ৫

পশ্চিমা সংস্কৃতি

ইংরেজি Culture শব্দের বাংলা অর্থ সংস্কৃতি। সংস্কৃতি বলতে বুঝায় একটি সমাজের সদস্যদের আচার-আচরণ, দৃষ্টিভঙ্গি, ভাষা, ধর্মীয় রীতি-নীতি, শিল্পকলা ইত্যাদিকে। সংক্ষেপে বলা যায়, সংস্কৃতি হচ্ছে মানুষের জীবন-পদ্ধতি।

আর পশ্চিমা সংস্কৃতি বলতে পশ্চিমা দেশগুলোর জীবনপদ্ধতিকে বুঝানো হয়। পশ্চিমা দেশগুলো হলো- যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স, জার্মানি, ইতালি, স্পেন, ডেনমার্ক, সুইডেন, সুইজারল্যান্ড, নেদারল্যান্ড, কানাডা ইত্যাদি।

খ্রিষ্টধর্মের সাথে ছিলো পশ্চিমাদের বসবাস। কিন্তু কালের পরিক্রমায় তারা তাদের ধর্মকে বিকৃত করে ফেলে। মধ্যযুগ পর্যন্ত ইউরোপে চার্চ বা গির্জা ছিলো সবকিছুর নিয়ন্ত্রক। খ্রিষ্ট পঞ্চম শতাব্দী থেকে ১৫শ শতাব্দী পর্যন্ত ছিল মধ্যযুগ। মধ্যযুগকে তারা অন্ধকার যুগ বলে আখ্যায়িত করে, এর একমাত্র কারণ ছিল ধর্ম। কারণ তখন ধর্মের উপর অন্য কোনো কিছুকে মর্যাদা দেওয়া হতো না। এই যুগের পর শুরু হয় রেনেসাঁ; এ সময় যুক্তি ও দর্শন বিদ্বানকে প্রাধান্য দেওয়া শুরু হয় এবং ধর্মের মর্যাদা বা প্রভাব কমতে থাকে।

পশ্চিমা সংস্কৃতির উল্লেখযোগ্য কিছু মূল দর্শন ও বৈশিষ্ট্য তুলে ধরা হলো :

রেনেসাঁ বা আধুনিকতার সূচনা

রেনেসাঁকে ইউরোপের 'পুনর্জাগরণের যুগ', 'নব-জাগরণ' বা 'নবজন্ম' নামে উল্লেখ করা হয়। ঠিক কবে থেকে রেনাসাঁ শুরু তা নিয়ে মতবাদ আছে। কেউ বলেছেন ১৩০০-১৬০০ পর্যন্ত, কেউ বলেছেন ১৩৫৮-১৬৫৮ পর্যন্ত, আবার কেউ বলেছেন ১৪৫৩-১৫২৭ পর্যন্ত।

এই যুগে ইউরোপ ধর্ম থেকে দূরে সরে যায় এবং পৃথিবীতে মানুষের উপর কিছু নেই, মানুষ সকল কিছুর নিয়ন্ত্রক, ধর্মের উপরে মানুষ সত্যসহ মানবতাবাদের জয়গান শুরু করেছিল। সর্বোপরি, ভুল-ভ্রান্তি সকল কিছুকে মানুষের খায়েশাতের উপর নির্ভরশীল করে তুলে। রেনেসাঁর সময় থেকে যতো ধরনের ভ্রান্তির জন্ম হয় সবকিছুর মূলে ছিলো ব্যক্তিসত্ত্বাবোধের ধারনা; যাকে হিউম্যান বিয়িং বলা হয়। আধুনিকতা, পাশ্চাত্য সংস্কৃতি-সভ্যতা কিংবা পুঁজিবাদী চিন্তাধারা 'হিউম্যান বিয়িং'কে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়।

এছাড়া এ যুগে ইউরোপে বিজ্ঞান ও শিল্পকলার বিকাশ ঘটে। ১৪৩৬ সালের দিকে গুটেনবার্গ আবিষ্কার করেন ছাপাখানা। যার ফলে রেনেসাঁর চেতনা ছড়িয়ো পড়ে সারা বিশ্বে। নাটক, সাহিত্য, কবিতা, চিত্রকর্মের মাধ্যমে ব্যাপকতা লাভ করে।

এনলাইটেনমেন্ট বা বুদ্ধিবৃত্তিক যুগ

১৭শ শতক থেকে শুরু হয় এনলাইটেনমেন্ট বা বুদ্ধিবৃত্তিক যুগ। রেনেসাঁ আর এনলাইটেনমেন্ট দুইটার মূল ধারা প্রায় সমান। এনলাইটেনমেন্ট এর মূল বৈশিষ্ট্য ৩টি

১. ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য (Individualism) : ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য বলতে বুঝায় সব মানুষ সমান, কেউ কাউকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে না। স্বাধীনতা বা সমতা সবার অধিকার; এতে অন্য কেউ হস্তক্ষেপ করতে পারবে না।

২. সংশয়বাদ (Skepticism) : পুরোনো সকল ধ্যান-ধারণাসহ সকল কিছুতে প্রশ্ন করা যাবে, সন্দেহ করা যাবে।

চার্চের অনেক কিছু বিনা প্রশ্নে মেনে নিয়ে, ইউরোপীয়দের অনেক জুলুম আর ভোগান্তির স্বীকার হতে হয়েছিল।এজন্য পুরোনো ধ্যান ধারনাকে আর মেনে নেওয়া যাবে না, সন্দেহ হলে প্রশ্ন করতে হবে।

৩. যুক্তি (Reason) : যুক্তিসংগত হলে কোনো কিছু মেনে নেওয়া হবে, যুক্তিসংগত না হলে মেনে নেওয়া যাবে না।

হিউম্যানিজম বা মানববাদ

'হিউম্যান রাইটস' আর 'হিউম্যান বিয়িং' মিলে হয় হিউম্যানিজম। যার মূল কথা, মানুষ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই (লা ইলাহা ইল্লাল ইনসান)।হিউম্যানিজম হলো সব মতবাদের মধ্যমণি।

জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত একজন মানুষের মৌলিক অধিকার ও স্বাধীনতা সমূহকে 'হিউম্যান রাইটস' বা মানবাধিকার বলা হয়। হিউম্যান রাইটস এর মূল ভিত্তি হচ্ছে স্বাধীনতা, সমত ও উন্নতি।

যারা এই হিউম্যান রাইটসের চর্চা করে এবং এর উপর বিশ্বাস রাখে, তাদের বলা হয় 'হিউম্যান বিয়িং' বা ব্যক্তি মানব।

হিউম্যান বিয়িং মানে আধুনকি চিন্তাধারা। কেউ যদি হিউম্যান বিয়িং না হয়, তাহলে পশ্চিমাদের কাছে সে মানুস হিসাবে থাকে না; সে হয়ে যায় বর্বর-অসভ্য। পশ্চিমাদের কাছে মানুষ হতে হলে আপনাকে হিউম্যান বিয়িং-এর আদর্শে আদর্শিত হতে হবে। না হলে আপানর

জান-মালের কোনো নিরাপত্তা নাই। যেকোনো সময় পশ্চিমারে আপনার উপর আক্রমণ করে আপনার জান-মাল নিয়ে নিবে।

সেক্যুলারিজম বা ধর্মনিরপেক্ষতা

সেক্যুলারিজম সহজভাবে ধর্মকে অস্বীকার করা।

ধর্মকে সবকিছু থেকে বাদ দিয়ে দেয়। রাষ্ট্র সব ধর্ম ও মতের প্রতি নিরপেক্ষ থাকবে। রাষ্ট্র থেকে ধর্মকে বিচ্ছিন্ন করা হবে। ধর্মীয় রীতি-নীতিতে রাষ্ট্রের কোনো কাঠামো চলবে না। এর মানে এই না যে, আপনি ধর্ম পালন করতে পারবেন না, বিষয়টা এমন না। আপনি ব্যক্তিগতভাবে ধর্ম পালন করতে পারবেন। কিন্তু অন্য কাউকে এ নিয়ে কিচ্ছু বলতে পারবে না। যেমন - একজন পিতা নামাজ পড়েন, কিন্তু তার ছেলে নামাজ পড়ে না। এখন সেই পিতা তার ছেলেকে নামাজ পড়ার জন্য জোর-জবরদস্তি করতে পারবে না।

শিক্ষা, রাজনীতি, সমাজনীতি সবকিছু থেকে ধর্ম মুক্ত। ধর্মকে ব্যক্তিগতভাবে শুধু পালন করা হয়। আধুনিকতার নামে ধর্মকে কখনো বিকৃতভাবে উপস্থাপন করা হয়।

উপনিবেশবাদ বা কলোনিয়ালিজম

উপনিবেশবাদ বলতে বুঝায়, এক দেশ আরেক দেশকে শাসন করে তার সম্পদ ব্যবহার করবে এবং সেখানে তাদের প্রভাব বিস্তার করে নিজের ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত করবে। আর তাদের নিজেদের ভাষা-সংস্কৃতি চাপিয়ে দেওয়া হয় দুর্বলদের উপর।

পাশ্চাত্যের উন্নতি-অগ্রগতি সবকিছুর মুল সূত্র হলো উপনিবেশবাদ। আমাদের দেশে উপনিবেশবাদ প্রতিষ্ঠা করে আমাদের সম্পদ লুঠপাট করে নিয়ে গেছে পশ্চিমারা।

William Digby নামের এক ব্রিটিশ ঐতিহাসিক-রাজনীতিবিদ লিখেছেন, 'পলাশীর যুদ্ধের পর বাংলার সম্পদ স্রোতের মতো এসে জমা হতে থাকে লন্ডনে। ১৭৬০সালেরর আগে যেখানে শিল্প কারখানার নাম গন্ধ ছিল না, সেখানে হাজার হাজার শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। [২১]

পশ্চিমারা সমুদ্রপথে আমাদের দেশের সম্পদ লুঠ করে নিতে। তাদের বড় বড় শিল্পকারখানা, বিজ্ঞানের উন্নতি সবকিছু ছিলো আমাদের সম্পদে করা।

বিংশ শতাব্দী

বিংশ শতাব্দী খুব গুরুত্বপূর্ণ সময়। এই সময় পশ্চিমারা পুরো বিশ্ববাসীর কাছে নিজেদের উন্নতি এবং শক্তি প্রদর্শন করে।

এই শতাব্দীতে পশ্চিমারা বিমান, রেডিও, টেলিভিশন, এটমবোমা, হাইড্রোজেন বোমা, আধুনিক যানবাহনসহ আরো অনেক কিছু আবিষ্কার করে। ঊনবিংশ শতাব্দীর উপনিবেশবাদ, তারপর বিংশ শতাব্দীর বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের ফলে তারা উন্নতির চরম শিখায় পৌঁছে যায়। তারপর, বিশ্বের অন্যান্য দেশ পশ্চিমা দেশের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে

শিক্ষা ও মিডিয়া (গণমাধ্যম)

পশ্চিমা শিক্ষাব্যবস্থায় ধর্মকে ব্যক্তিগত বিষয় হিসেবে দেখা হয়। মানুষের যুক্তি ও বুদ্ধিকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেওয়া হয়। এখানে বলা হয়, মানুষ নিজের বুদ্ধি দিয়ে ঠিক ও ভুল নির্ধারণ করবে, ধর্মীয় নির্দেশে নয়। এই শিক্ষার প্রভাবে ধর্মীয় নৈতিকতা, পারিবারিক দায়িত্ব এবং সামাজিক মূল্যবোধের গুরুত্ব কমে যায়।

অন্যদিকে, পশ্চিমা সংস্কৃতির বিস্তারে মিডিয়া সবচেয়ে শক্তিশালী মাধ্যম।
টেলিভিশন, সিনেমা, কার্টুন, গেমস এবং সোশ্যাল মিডিয়া তরুণ প্রজন্মকে পশ্চিমা জীবনধারার সাথে পরিচয় করায়। মানুষকে উন্নত বিলাসী জীবন অতিবাহিত করতে উৎসাহী করে।
মিডিয়ায় পরিবার, বিবাহ এবং নারীর ভূমিকা এমনভাবে দেখানো হয় যা ইসলামী মূল্যবোধের বিপরীত। ফলে মুসলিম পরিবার ও সামাজিক কাঠামোতে পরিবর্তন আসে।

পশ্চিমাদের ধর্মীয় ইতিহাস ও পরিবর্তন

হাজার বছর ধরে খৃষ্টধর্মের সাথে ইউরোপের বসবাস। খ্রিষ্ঠানদের ধর্ম বিশ্বাস অনুযায়ী, মানবজাতি আদম ও ইভের করা আদিপাপের বোঝা বহন করছে। তাই গোটা দুনিয়া হলো অভিশপ্ত জায়গা, দুনিয়াতে মানুষের জন্য কল্যাণকর কিছু নেই।
সেন্ট পল বা পৌল ছিলো একজন খ্রিস্টান ধর্মপ্রচারক। তার জন্ম আনুমানিক ৫ খ্রিষ্টাব্দে, মৃত্যু ৬৪ বা ৬৭ খৃষ্টাব্দে। পল প্রথম জীবনে ছিল খ্রিষ্টধর্মবিদ্বেষী ও খৃষ্টানদের প্রতি অত্যাচারী একজন ইহুদি। পরবর্তী সময়ে সে খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করে এবং তাতে নানা রকম বিকৃত ও পরিবর্তন ঘটিয়ে মানুষের মাঝে প্রচার শুরু করে। সেন্ট পলের প্রচারিত খৃষ্টবাদ প্রতিষ্ঠিত ছিল ঈসা আলাইহিস সালামের অলৌকিক জন্মা, আলৌকিক কার্যক্রম এবং আধ্যাত্মিক

জগতের উপর। স্বাভাবিকভাবেই অলৌকিক এসব বিষয় প্রকৃতির নিয়মনীতি ও যুক্তি বিপরীত হয়ে থাকে।

আদিপাপ থেকে মুক্তি পেতে ও খ্রীস্টের প্রিয়পাত্র হতে হলে এই দুনিয়ার চাহিদাকে কমাতে হবে। যাজক-নানরা বিয়ে করতে পারবে না, পানি ব্যবহার ত্যাগ, লাগাতার উপবাস, মানবিক চাহিদা বঞ্চিত করা, আত্মীয়দের বঞ্চিত করে চার্চের নামে সম্পদ লিখে দেওয়া ইত্যাদির মধ্যে স্বর্গ তালাশ করতে হবে। এছাড়াও, আরো নানানভাবে মানুষের উপর জুলুম-অত্যাচার করা হতো। বুজুর্গ হওয়ার মাপকাঠি ছিলো - যৌনতা থেকে নিজেকে দূরে রাখা, ঘর-সংসার না করা, নারী সংস্পর্শ থেকে দূরে থাকা। স্বয়ং পাদরিদের পক্ষেও এসব রীতি-নীতি মানা সম্ভব হয়নি, তারা অনৈতিক কাজে জড়িয়ে পড়তো; ফলে চার্দে বেড়েছিলো যৌন সহিংসতা।
আসলে ফিতরাতের সাথে বিদ্রোহ করে মানুষ কখনো চলতে পারেনা। আল্লাহ তা'লা জন্মগত যেসব চাহিদা দিয়েছেন, সেগুলো নিয়েই চলতে হবে। ইসলাম এমন কোনো বিধান দেয়নি যা মানুষের ফিতরাতের সাথে সাংঘর্ষিক। কিন্তু অন্যান্য ধর্মে এমন সাংঘর্ষিক বিষয় ছিলো। বিশেষত, খৃষ্টধর্মে এমন সাংঘর্ষিক বিষয় থাকার কারণে এক সময় ধর্মীয় মূল্যবোধ থেকে তাদের বিশ্বাস উঠে যায়। তারা ব্যক্তিকেন্দ্রিক আর বিজ্ঞানী মতধারায় বিশ্বাসী হয়ে উঠে।

মধ্যযুগ পর্যন্ত চার্চ শুধু ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানই নয়, বরং সামাজিক, রাজনৈতিক এবং নৈতিক জীবনও নিয়ন্ত্রণ করত। পরিবার, বিবাহ এবং নৈতিকতার ক্ষেত্রে চার্চকে সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষ হিসেবে গণ্য করা হতো। তবে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে চার্চের ধর্ম বিকৃতি, অপকর্ম আর জুলুমের কারণে সাধারণ মানুষের ধর্মীয় মূল্যবোধ কমতে থাকে। রেনেসাঁ যুগে মানুষ ধীরে ধীরে চার্চের নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্ত হতে শুরু করে। রিফরমেশন আন্দোলন এবং তারপর এনলাইটেনমেন্ট যুগে ধর্মকে ব্যক্তিগত সীমাবদ্ধতায় আনা হয়; যুক্তি ও বিজ্ঞানের উপর গুরুত্ব প্রদান করা হয়। এই সব পরিবর্তনের ফলে পশ্চিমা সমাজে ধর্মীয় নৈতিকতার প্রভাব কমে যায় এবং ব্যক্তিকেন্দ্রিক, যুক্তিক আর বৈজ্ঞানিক মতবাদকে প্রাধান্য দেওয়া শুরু হয়।

অধ্যায় ৬

পশ্চিমাদের সবচেয়ে বড় আগ্রাসন

পশ্চিমা আগ্রাসন বলতে পশ্চিমা দেশগুলোর চিন্তা-চেতনা, আচরণ, সংস্কৃতি বা জীবনধারা অন্য দেশ বা সমাজের উপর চাপিয়ে দেওয়ার প্রক্রিয়াকে বুঝায়। যে সমাজের উপর চাপানো হয় সেই সমাজের নিজস্ব সংস্কৃতি, ধর্মীয় মূল্যবোধ ও সামাজিক কাঠামো দুর্বল হয়ে যায়।
মধ্যযুগে ইউরোপ ধর্মীয় কর্তৃত্বের অধীনে ছিল। রেনেসাঁ এবং এনলাইটেনমেন্ট এর মাধ্যমে ধর্মীয় আদর্শ ও নৈতিকতা থেকে ইউরোপ বের হয়ে পড়ে। ব্যক্তিস্বাধীনতা এবং যুক্তি সকল ক্ষেত্রে প্রাধান্য পায়। পশ্চিমা জীবনধারার এই ব্যক্তিস্বাধীনতার ধারা শিক্ষা, মিডিয়া, অর্থনীতি ও বিভিন্ন দর্শনের মাধ্যমে মুসলিম সমাজে প্রবেশ করে। ফলে মুসলিম সমাজের পারিবারিক কাটামো ও ধর্মীয় মূল্যবোধ অনেকটা দুর্বলের দিকে অগ্রসর হয়। কারণ, পশ্চিমারা তাদের দর্শন বা মতবাদকে চাকচিক্যময় করে বিশ্বের কাছে তুলে ধরতো আর ধর্মীয় মূল্যবোধাকে শেকেলে বলতো। পরিবারের দায়িত্ব-কর্তব্য, শৃঙ্খলা পরিবর্তন হতে থাকে।
এই অধ্যায়ে পশ্চিমাদের সবচেয়ে বড় আগ্রাসনের দিকগুলো বিশ্লেষন করা হবে-

নারীবাদ বা ফেমিনিজম

ইউরোপের খৃষ্টান সমাজে নারীদের নির্যাতনের ইতিহাস অনেক পুরনো। প্রচলিত ধর্মের দোহাই দিয়ে তারা মূলত নারীদেরকে নিচু করে দেখতো এবং তারা নারীদের অধিকারের বিষয়ে সম্পূর্ণ বেখবর ছিল।
চতুর্দশ শতাব্দীতে ইতালিয় বংশোদ্ভূত ফরাসি লেখিকা ক্রিস্টিন ডি পাইজান সমসাময়িক নারী বৈষম্যের বিরুদ্ধে 'দ্য বুক অফ দ্য সিটি অফ লেডিস' বইটি লিখেছিলেন। এছাড়া আরো অনেক লেখিকা এই বিষয়ে লেখালেখি করেন। এভাবে খিষ্ট ধর্মের সাথে নারীদের ঠান্ডা মাথায় এক যুদ্ধের মাধ্যমে নারীবাদী মতবাদের শুরু হয়।
স্বাধীনতা, সমতা ও উন্নতি নারীবাদীদের মূল মন্ত্র-তন্ত্র। তার মধ্যে নারী-পুরুষের সমান অধিকার অন্যতম। পুরুষরা যা কিছু করে বা করতে সক্ষম সেই কাজগুলো নারীরাও করতে চায়।

নারীবাদকে আমরা মোটাদাগে ৩টা দাবি বা স্লোগানের মাধ্যমে দেখতে পারি যথা-

১. নারীর উপর কারো কর্তৃত্ব থাকবে না, বরং নারী স্বয়ংসম্পূর্ণ। স্বামী, সন্তান, পরিবার সবই পুরুষতান্ত্রিক সমাজের চাপিয়ে দেওয়া বিষয়। নারীর স্বাধীনভাবে বেঁচে থাকার জন্য কারো প্রয়োজন নেই।

২. পুরুষ কখনো নারীর আস্থা বা ভরসার জায়গা হতে পারে না। এজন্য তার উপর নির্ভর না করে, তার সাথে তাল মিলিয়ে চলতে হবে। অর্থাৎ নারী পুরুষের মধ্যে এক ধরনের প্রতিযোগিতা থাকতে হবে।

৩. অর্থনৈতিক স্বাবলম্বিতাই নারীর একমাত্র সম্মান। পুরুষের আয়ের উপর নির্ভরশীল না হয়ে, নারীরা নিজস্ব আয়ে স্বাবলম্বী হতে হবে। অর্থ্যাৎ, পুরুষের মতো ঘরের বাইরে বের হয়ে ইনকাম করতে হবে।

নারী-পুরুষ একে অপরের প্রতিপক্ষ নয়। আল্লাহ সুবাহান তা'লা নারী পুরুষকে একে অপরের পরিপূরক হিসেবে সৃষ্টি করেছেন

ঘর-সংসারের প্রতি মনোযোগী হওয়া, সন্তান প্রতিপালন, পুরুষকে পরিবারের প্রধান হিসাবে মেনে নেওয়া মানেই নারীবাদীদের কাছে পরাধীনতা ; অথচ এগুলো নারীর সহজাত ভূমিকা। নারীবাদীরা পর্দার বিধানকে সেকেলে আর বস্তাবন্দী বলে আখ্যায়িত করে। নারীবাদীরা বুঝাতে চায় যে যুগ যুগ ধরে মানুষ কুসংস্কারের মাঝে ডুবে আছে। নারীরা কেবল ঘর সামলাবে, বাচ্চা লালন পালন করবে, আর স্বামী খেদমত করবে— এমন না। নারীরাও পুরুষের মতো বাইরে কাজ করবে; পরিচয় যেমন বেঁচে থাকার অধিকার আছে নারীরও তেমন আছে। নারী-পুরুষের মাঝে সমতা প্রতিষ্ঠিত করতে হবে।

কিন্তু ইসলাম সমতাকে মানদন্ড মানে না। ইসলাম সর্বদা ন্যায় ও ইনসাফের পক্ষে থাকে। কারণ ক্ষেত্র বিশেষ সমতা এক পক্ষের জন্য জুলুম হয়ে যেতে পারে। ইসলাম বলে, 'যার সেই কাজ সে সেই কাজ করবে।' অর্থ্যাৎ নারীর কাজ নারী করবে, আর পুরুষের কাজ পুরুষ করবে। কারণ সৃষ্টিগতভাবে শারীরিক-মানসিকসহ সকল ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে।

নারী-পুরুষ সমতা

সমতা, সমান অধিকার এই স্লোগানগুলো খুব জোড়ালোভাবে বিশ্বব্যাপী চালু হয়েছে। আর এসবের মাধ্যমে নারী-পুরুষের মাঝে এক প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছে। যেখানে নারী-পুরুষ ভিন্ন ভিন্ন কাজে একে অপরের উপর নির্ভরশীল ছিলো; সেখানে নারী-পুরুষের নির্ভরশীলতা কমে গিয়ে একে অপরের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে গেছে।

'আমি পারলে, তুমি কেনো পারবে না?'— টাইপ মনোভাব সৃষ্টি হয়েছে।

পুরুষ বাইরে শ্রম দিবে আর নারী শ্রম দিবে ঘরে। এখন যদি নারী-পুরুষ দু'জনই একসাথে বাইরে চলে যায় তাহলে ঘর সামলাবে কে? সন্তানের দেখাশুনা করবে কে?
ধরেন, দু'জন একসাথে বাইরে কাজ করে এসে তারপর আবার একসাথে ঘরে কাজ করলো। এতে দু'জনের উপর কষ্ট একটু বেশি হয়ে গেলো না? ঘরেও কাজ, আবার বাইরেও কাজ; দিগুন শ্রম লাগলো। শারীরিক-মানসিক ধকল গেলো দ্বিগুন, যার ফলে বিশ্রাম কম, মেজাজ বিক্ষিপ্ত, আর পারিবারিক অশান্তি তো আছে।

পশ্চিমারা নারী-পুরুষের সমতা চায় আর ইসলাম চায় নারী-পুরুষের ন্যায্যতা। সমতা সব সময় ইনসাফ নিশ্চিত করে না। কিন্তু ন্যায্যতা ইনসাফ নিশ্চিত করে। বিয়েতে মোহর থেকে শুরু করে উত্তরাধিকার আইনে ইসলাম নারী-পুরুষের এই ন্যায্যতাকে নিশ্চিত করেছে। ইসলাম যদি সমতাকে নিশ্চিত করতো তাহলে, একজনের উপর জুলুম হয়ে অপরজন জালিম হয়ে যেতো। ইসলাম সব সময় ইনসাফপূর্ণ বিচার কার্য সম্পাদন করে।

ক্যারিয়ার বনাম মাতৃত্ব

ইবনুল কাইয়ুম রহিমাহুল্লাহ বলেছেন,
"উম্মাহর অর্ধেক হচ্ছে নারী আর অর্ধেককে জন্ম দিয়েছে নারী। তাই বলা যায়, পুরো উম্মাহই হলো নারী।" [২২]

কিন্তু আজকে অনেক নারীদের কাছে সন্তানের চেয়ে ক্যারিয়ার বড়। ক্যারিয়ারের কথা চিন্তা করে অনেকে দেরীতে বাচ্চা নেয়। অনেকে বাচ্চা জন্মের কয়েক মাস পর আবার ক্যারিয়ার গড়ায় মনোযোগী হয়ে যান। ফলে বাচ্চার দেখাশুনা করে কাজের লোক। মায়ের তরবিয়াত আর কাজের লোকের তরবিয়াত নিশ্চয় সমান না।
কথা-বার্তা, আদব কায়দাসহ দ্বীনের প্রাথমিক শিক্ষা সন্তান মায়ের কাছ থেকে শিখে। যখন মা থেকেও অনুপস্থিত হয়ে যায়, সেটা সন্তানের জীবনে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। সুষ্ঠ তরবিয়াতের অভাবে সন্তানরা অনেক সময় খারাপ পথে চলা শুরু করে। বাবার সংস্পর্শটা সন্তানরা একটু কম পায়, কারণ বাবা বাইরে কাজে থাকেন। মায়ের সংস্পর্শে সন্তান বেড়ে উঠে উত্তমভাবে।
আধুনিকতা আর পশ্চিমা সংস্কৃতির কবলে পড়ে বর্তমানে, নারীর মাতৃত্ব হারিয়ে যাচ্ছে। ক্যারিয়ারে ফোকাস হতে গিয়ে অনেকের মাতৃত্বের ক্ষমতা দুর্বল হয়ে পড়ছে।

নারীর পর্দা

নারীর পর্দা, মাতৃত্ব আর ক্যারিয়ার এই তিনটা জিনিস নিয়ে পশ্চিমাদের বেশি আগ্রহ। পশ্চিমাদের সবচেয়ে বড় আগ্রাসন হচ্ছে নারীকে ক্যারিয়ারমুখী করে ঘরের বাইরে বের করে আনা। ঘরের বাইরে বের হলে নারীরা সংসারবিমুখ হবে, মাতৃত্বের হার কমবে এবং নারীর পর্দার বিষয়ে শীতিলতা চলে আসবে।

নারীবাদীসহ ও পশ্চিমা বিভিন্ন এজেন্ডা প্রচার করে পর্দার বিধান নারীদের জন্য লজ্জাজনক এবং এটি নারীদের স্বাধীনতার পথে বাধা।

অথচ পর্দা কখনোই নারীর স্বাধীনতার পথে বাধা নয় বরং পর্দা নারীকে সম্মানিত করে, নফসের দাসত্ব থেকে মুক্তি দিয়েছে।

কিন্তু পশ্চিমা বিশ্ব দীর্ঘদিন ধরে এই পরিচয়ের ওপর সরাসরি ও পরোক্ষ আক্রমণ চালিয়ে যাচ্ছে। তাদের ধারণা—নারীর স্বাধীনতা মানেই শরীর উন্মুক্ত করা, আর ব্যক্তিস্বাধীনতা মানে ধর্মীয় নির্দেশনা থেকে মুক্ত থাকা। এর ফলে পর্দাকে তারা 'নারীর স্বাধীনতা হরন', 'বাধা', 'দমন', 'পুরুষতান্ত্রিক চাপ' হিসেবে উপস্থাপন করে।

পর্দা ও হিজাব মুসলিম নারীর মর্যাদার প্রতীক। পবিত্র কুরআন মাজীদে সৎকর্মশীল মুমীন নারীর বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেন,

يٰٓاَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّاَزْوَاجِكَ وَبَنٰتِكَ وَنِسَآءِ الْمُؤْمِنِيْنَ يُدْنِيْنَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيْبِهِنَّ ؕ ذٰلِكَ اَدْنٰٓى اَنْ يُّعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا

অর্থ : হে নবী, আপনি আপনার পত্নীগণ-কন্যাগণ এবং মুমিন নারীদের বলুন, তারা যেন তাদের চাদরের কিয়দংশ নিজেদের উপর টেনে নেয়। এতে তাদেরকে চেনা সহজ হবে এবং তারা উপদ্রব ও নিপীড়নের শিকার হবে না। আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।" [২৩]

আয়াতের মধ্যে جَلَابِيْب শব্দটি جِلْبَاب এর বহুবচন। জিলবাব এমন এক পোশাক বা এমন বড় চাদরকে বলা হয়, যাতে পুরো শরীর ঢেকে যায়। নিজের উপর চাদর টেনে নেওয়ার অর্থ চেহারার উপর এমন ভাবে ঘোমটা নেওয়া যাতে চেহারার অধিকাংশ অংশ ঢেকে যায় এবং চক্ষু নিচু করে চলাতে রাস্তাও দেখা যায়। এর দ্বারা পর্দার হিকমত, যৌক্তিকতা ও উপকারিতা ফুটে উঠেছে।

ইন্টারফেইথ বা আন্তঃধর্ম

পশ্চিমা সংস্কৃতির গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো 'সব ধর্ম সমান' বা ইন্টারফেইথ ধারণা। বর্তমান মুসলিমদের জন্য সবচেয়ে বড় ফেতনা হচ্ছে ইন্টারফেইথ।

মানবজাতির জন্য ইসলাম একমাত্র পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা। ইসলামের সাথে অন্য ধর্মের তুলনা কিংবা মর্যাদা হয়না। কারণ, এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে মনোনীত একমাত্র ধর্ম। আর স্রষ্টার সাথে কখনোই সৃষ্টির তুলনা হয়না। ইন্টারফেইথ মানবসৃষ্ট একটা মতবাদ বা ধারণা।
ইসলাম অন্য ধর্মের প্রতি সহনশীলতা শেখায়, কিন্তু সব ধর্মকে সমান মনে করা শিখায় না। অন্যদিকে, ইন্টারফেইথ সব ধর্মকে সমান মনে করা শিখায়।
বাংলাদেশে এই ইন্টারফেইথ বিশ্বাস প্রচারে 'কোয়ান্টাম মেথড' সক্রিয়ভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

সমকামিতা

১৯৮৭ সালে আমেরিকান ম্যাগাজিন ‘Guide’-এ মার্শাল কার্ক ও হান্টার ম্যাডসেনের লেখা প্রায় ৫ হাজার শব্দের একটি আর্টিকেল প্রকাশিত হয়। দু’বছর পরে ১৯৮৯ সালে এটি ‘After the Ball: How America Will Conquer Its Fear and Hatred of Gays in the 90s’ নামের বইয়ে প্রকাশিত হয়, যা মূলত সমকামিতাকে স্বাভাবিক ও গ্রহণযোগ্য হিসেবে প্রচার করার উদ্দেশ্যে লেখা হয়েছিল।

অনেকে সমকামিতাকে জন্মগত লক্ষণ বলে মনে করে, কিন্তু এটি জন্মগত নয়। ইসলামি দৃষ্টিকোণ থেকে এটি হারাম এবং একটি নৈতিক বিকৃতি। লিঙ্গ পরিবর্তনের সার্জারিও (ছেলে থেকে মেয়ে হওয়া, মেয়ে থেকে ছেলে হওয়া) স্বাভাবিক নয়; এটি মানসিক বিকৃতির অংশ হিসেবে দেখা হয়। ছেলে-ছেলে বা মেয়ে-মেয়ে বিবাহও ইসলামে হারাম।

ধর্মীয় দিক থেকে সমকামিতা মারাত্মক পাপ। কওমে লুতকে আল্লাহ তা'লা সমকামিতার জন্য ধ্বংস করেছিলেন। লুত (আঃ)-এর সম্প্রদায়সহ তার স্ত্রীও এই পাপের জন্য ধ্বংস হয়েছে। একজন নবীর স্ত্রী হয়েও, সে আল্লাহর আযাব বা ক্রোধ থেকে রক্ষা পায়নি। হাদিসে সমকামিদের ব্যাপারে কঠোর সতর্কবার্তা রয়েছে; রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন,
"যাদেরকে তোমরা লুতের সম্প্রদায়ের কাজে (সমকামে) লিপ্ত দেখবে তাদের উভয়কেই হ*ত্যা করো।" [২৪]

ইবনুল জাওযী রহিমাহুল্লাহ বলেন,
"সমকামী ব্যক্তি আকাশের প্রতি ফোঁটা পানি দিয়ে গোসল করলেও আল্লাহর সামনে নাপাক অবস্থায় উঠবে।" [২৫]

পশ্চিমা দেশগুলো সমকামী সম্পর্ককে বৈধ করার জন্য আন্তর্জাতিক সংস্থা ও মানবাধিকার তহবিলের মাধ্যমে উন্নয়নশীল দেশে চাপ দিচ্ছে। ১৯৯৪ সালে WHO ঘোষণা করেছে, সমকামিতা কোনো অসুস্থতা নয়, বরং স্বাভাবিক প্রক্রিয়ার একটি অংশ। অথচ, '১৯৭৩ সালের আগ পর্যন্ত আমেরিকান সাইক্রিয়াট্রিক অ্যাসোসিয়েশন এটিকে মানসিক অসুস্থতা মনে করত।' [২৬]

বর্তমানে ১৯৫টি দেশের মধ্যে ১২৪ দেশে সমকামিতা বৈধ এবং ২৭ দেশে সমকামী বিবাহ বৈধ। অনেক দেশে স্বীকৃতি প্রক্রিয়া চলমান।

সমকামিতা কেবল ব্যক্তিগত আচরণ নয়, এটি **পশ্চিমা সংস্কৃতির একটি বড় আগ্রাসন**, যা নৈতিকতা, পরিবার এবং ধর্মীয় মূল্যবোধকে দুর্বল করার লক্ষ্যে চালু হয়েছে।

মানবাধিকার

জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত একজন মানুষের মৌলিক অধিকার ও স্বাধীনতা সমূহকে মানবাধিকার বলে। ১০ ডিসেম্বর ১৯৪৮ সালে জাতিসজ্ঘ মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণা প্রদান করে। যেখানে জীবন, স্বাধীনতা, শিক্ষা, ধর্ম, ভাষা, সংস্কৃতি ইত্যাদিকে মৌলিক অধিকার হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়।

মানবাধিকার সব জায়গায় এবং সবার জন্য সমানভাবে প্রযোজ্য। কিন্তু বিশ্বব্যাপী আঞ্চলিক যুদ্ধ, সংঘাত, হানাহানির কারণে বার বার মানবাধিকার লংঘিত হচ্ছে। পশ্চিমা বিশ্বের নেতারা মানবাধিকার নিয়ে সচেতন। অথচ ইতিহাস প্রমাণ করে, দেশে দেশে তারাই সবচেয়ে বেশি মানবাধিকার লঙ্ঘন করছে।

সাম্প্রতিক সময়, ফিলিস্তিনে গণহত্যা চালাচ্ছে ইসারাইল। আর এই ইসরাইলকে সব ধরনের সাহায্য-সহযোগিতা করছে আমারেকি। মানবাধিকারের সবক দেওয়া রাষ্ট্রই অন্য দেশে গণহত্যা চালাচ্ছে। আফগানিস্তানেও তারা এমন হত্যা-নিপীড়ন চালিয়েছিল গতো কয়েক বছর। এছাড়াও আরাকান, দক্ষিণ ফিলিপাইন (মিন্দানাও), কাশ্মির, লেবানন, ইরাক, বসনিয়া-হার্জেগোভিনা ও কসোভোর নিরীহ জনগণকে হত্যা, গুম, খুন ও ধর্ষণ এবং তাদের ওপর রাষ্ট্রীয় সহিংসতা বন্ধে জাতিসজ্ঘের কোনো ইতিবাচক ভূমিকা দেখা যায়নি। জাতিসংঘ যেখানে গেছে, সেখানেই সবকিছু ধ্বংস হয়েছে। জাতিসংঘের এতোসব নীতি মুসলিম কোনো দেশের সাহায্যের সময় দেখা যায় নি। মুসলিমদের মানবাধিকারে জাতিসংঘ নীরব দর্শক। সবার

মানবাধিকার আছে, কিন্তু মুসলিমদের স্বাধীনভাবে বেঁচে থাকার মানবাধিকার হরণ করছে এই পশ্চিমা এজেন্ডাগুলো।

পশ্চিমা দেশে স্থায়ী বসবাস

পশ্চিমা উন্নতি আর আধুনিকতা দেখে অনেকে তাদের দেশে পাড়ি জমান। জীবনের লক্ষ্য মানে ইউরোপ-আমেরিকায় স্যাটেল হওয়া। কারণ, তাদের সিস্টেমটা পুরোপুরি ব্যক্তিকেন্দ্রিক আর স্বাধীন। অথচ, অমুসলিম-কাফিরদের দেশে বসবাস করা মুসলিমের জন্য খুবই বিপজ্জনক। যারা সেখানে বসবাসের জন্য গিয়েছে, তাদের অনেকেই বিপথগামী হয়েছে। নিজের দ্বীন থেকে অনেক দূরে চলে গেছে। আর অনেকই ঠিকঠাক মতো দ্বীন পালন করতে পারলেও, তাদের পরের জেনারেশন অথবা ৩য় জেনারেশন দ্বীন থেকে ছিটকে পড়ে যায়। তারা শুধু জন্মসূত্রে আর নামে মুলিম থাকে; অনেকের তো নামও থাকে অমুসলিমদের অনুকরণীয়।

অনেক উলামায়ে-কেরাম স্থায়ীভাবে অমুসলিম দেশগুলোতে বসবাস করাকে নাজায়েজ বলেছেন। আর যারা জায়েজ বলেছেন, তারা বসবাসের জন্য ২-৩টা শর্ত দিয়েছেন। যেমন- দাওয়াতি সফরের জন্য যাওয়া, দেশে কোনো কর্মসংস্থান বা চাকরি না পেলে যাওয়া, চিকিৎসার জন্য যাওয়া অথবা উচ্চশিক্ষার জন্য যাওয়া(উচ্চশিক্ষার জন্য গেলেও নিজের ঈমান-আমলের বিষয়ে সতর্ক থাকতে বলা হয়)।

সর্বোপরি, স্থায়ীভাবে থাকার সময় মুসলিমরা সেই দেশের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে নিতে বাধ্য হয়। এতে পরিবারিক মূল্যবোধ, ধর্মীয় বিধি-নিষেধ এবং পরিচয় অনেক সময় দুর্বল হয়ে যায়। উদাহরণস্বরূপ, হিজাব পরা, নামাজ মেনে চলা, ইসলামী খাদ্যাভ্যাস বজায় রাখা ইত্যাদি ধীরে ধীরে কঠিন হয়ে যায়।
অতিরিক্ত স্বাধীনতা, ধর্মনিরপেক্ষ পরিবেশ, এবং সামাজিক বন্ধনগুলো মুসলিমদের ইসলামিক মূল্যবোধের সঙ্গে দ্বন্দ্ব তৈরি করে। স্থায়ীভাবে অন্য দেশে বসবাস করার আগে উচিত নিজের দ্বীন, পরিবার, এবং ভবিষ্যত প্রজন্মের ঈমান কতটুকু নিরাপদ থাকবে—এই বিষয়গুলো গভীরভাবে চিন্তা করা। যে পরিবেশে ঈমান রক্ষার সুযোগ কম, সেখানে স্থায়ীভাবে বসবাস করা একজন মুসলিমের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ বিষয়।

উচ্চ শিক্ষার জন্য পশ্চিমা দেশে যাওয়া

পশ্চিমা দেশগুলোতে উচ্চশিক্ষার সুযোগ অনেক বেশি, তাই অনেকে পড়ালেখার জন্য এই দেশগুলোতে যায়। সাধারণত তারা **স্টুডেন্ট ভিসা** নিয়ে দেশের বাইরে যাত্রা করে। লক্ষ্য থাকে, কয়েক বছর দেশগুলোতে থেকে পড়ালেখা করে আবার নিজ দেশে ফেরত আসবে। কিন্তু ঐসব দেশে থাকার ফলে তাদের চিন্তা-চেতনাও পশ্চিমাদের মতো হয়ে যায়। কারণ, সহবত অনেক গুরুত্বপূর্ণ একটা জিনিস। আপনি যার সহবতে থাকবেন, তার আদর্শেই আদর্শিত হবেন। আপনার ব্রেইন আর মন দুইটাই তাদের মতো হয়ে যাবে। পশ্চিমা সংস্কৃতির সঙ্গে মানিয়ে নিতে বাধ্য হবেন যেমন পোশাক, খাদ্যাভ্যাস, বন্ধুত্ব এবং বিনোদনের ধরন। পশ্চিমা পরিবেশ ফ্রী-মিক্সিং আর অশালীনতার পরিবেশ; যা অনেকের নৈতিক অবক্ষয়তা শুরুর যাত্রা হিসাবে কাজ করে।

পশ্চিমা দেশে গিয়ে উচ্চশিক্ষার উদ্দেশ্য অর্জিত হলেও, অনেক শিক্ষার্থী **সাংস্কৃতিক ও মানসিক পরিবর্তনের শিকার হয়**। এটি এক ধরনের **পশ্চিমা আগ্রাসন**, যা মুসলিম শিক্ষার্থীর ঈমান, পরিচয় এবং পারিবারিক মূল্যবোধকে নষ্ট করে দেয়।

পশ্চিমা সংস্কৃতির বিকাশে মিডিয়ার ভূমিকা

পশ্চিমা সংস্কৃতি প্রচারে মিডিয়া সবচেয়ে বেশি শক্তিশালী একটি মাধ্যম হিসেবে কাজ করেছে। বিশেষ করে ২০ শতকের শেষ ভাগ থেকে স্যাটেলাইট টেলিভিশন, সিনেমা, কার্টুন, সংগীত, বিজ্ঞাপন এবং পরবর্তীতে ইন্টারনেট-ভিত্তিক সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম যেমন—ফেসবুক, ইন্সট্রাগ্রাম, ইউটিউব, টিকটক ইত্যাদি আবিষ্কারের ফলে পশ্চিমা সংস্কৃতি দ্রুত বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়ে।

এই মিডিয়া পশ্চিমাদের জীবনযাপন, পোশাক, বিনোদন, প্রেম-সম্পর্ক, পরিবার ধারণা, নারীর স্বাধীনতা ইত্যাদি বিষয়কে আকর্ষণীয় ও আধুনিক হিসেবে তুলে ধরে। ফলে ধীরে ধীরে অনেক মানুষ নিজেদের সমাজ, ধর্মীয় মূল্যবোধ ও পরিবার কাঠামোকে পিছিয়ে পড়া বা পুরোনো মনে করতে শুরু করে। অন্যদিকে ধর্মীয় মূল্যবোধকে অনেক সময় গোঁড়ামি বা রক্ষণশীলতার সাথে যুক্ত করে দেখানো হয়। ফলে মুসলিম সমাজে এক ধরনের মানসিক এবং সাংস্কৃতিক দ্বন্দ্ব তৈরি হয়। বিশেষত নতুন প্রজন্ম মিডিয়ার মাধ্যমে পশ্চিমা সংস্কৃতির সাথে ঘনিষ্ঠ হয়ে পড়ছে, যা পারিবারিক এবং সামাজিক টানাপোড়েন সৃষ্টি করে।

মোটকথা, মিডিয়া শুধুমাত্র তথ্যের উৎস নয়; বরং একটা জাতির ধারণা, রুচি, আচরণ, মূল্যবোধ—সবকিছু ধীরে ধীরে গড়ে দেয়। তাই পশ্চিমা মতাদর্শ ও সংস্কৃতি মুসলিম সমাজে যে পরিবর্তন এনেছে, তার পেছনে মিডিয়ার ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও প্রভাবশালী।

অধ্যায় ৭

মুসলিম পারিবারিক কাঠামোতে পশ্চিমা সংস্কৃতির প্রভাব

বর্তমান যুগে পশ্চিমা সংস্কৃতির প্রভাব মুসলিম পারিবারিক কাঠামোতে বেশি দেখা যাচ্ছে। টিভি, মোবাইল, ইন্টারনেট এবং বিভিন্ন বিনোদনের মাধ্যমে পশ্চিমা জীবনধারা সহজেই ঘরে পৌঁছে যাচ্ছে। পশ্চিমা সংস্কৃতিতে স্বাধীনতা ও ব্যক্তিগত সিদ্ধান্তকে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মনে করা হয়; ফলে মুসলিম পরিবারের সদস্যদের মধ্যে দায়িত্ব-শৃঙ্খলা পরিবর্তন, আত্মপরিচয়হীনতা, মানসিক দ্বন্দ্ব এবং নৈতিক অবক্ষয় সৃষ্টি হয়েছে।

মুসলিম পরিবার শুধুমাত্র দাম্পত্য সম্পর্ক নয়, বরং সন্তান লালন-পালন, নৈতিকতা, আদর্শ জীবন এবং ইসলামী মূল্যবোধ রক্ষার কেন্দ্র। ইসলাম পরিবারকে একটি পূর্ণাঙ্গ সামাজিক ও মানসিক নিরাপত্তার জায়গা হিসেবে বিবেচনা করে। পরিবার হচ্ছে সবকিছুর কেন্দ্রবিন্দু। পরিবারের মধ্যে শালীনতা-শৃঙ্খলা থাকলে, তা ব্যক্তির মধ্যেও প্রকাশ পায়। আর পরিবারের মধ্যে সেটা না থাকলে, কোথাও তা পাওয়া যায় না। পরিবারের কাঠামো পরিবর্তন করতে পারলে, একটা সমাজ বা জাতির কাঠামো স্বাভাবিকভাবে পরিবর্তন হয় যায়। পশ্চিমারা ঠিক তাই করতেছে, তাদের সংস্কৃতি দিয়ে মুসলিম পরিবারের কাঠামো পরিবর্তন করে দিচ্ছে।

মুসলিমর পারিবারিক কাঠামোতে পশ্চিমা সংস্কৃতির প্রভাব তুলে ধরা হলো :-

১. পশ্চিমা সংস্কৃতির প্রভাবে যৌথ পরিবার ভেঙে একক পরিবারের সংখ্যা বাড়ছে। একসময় যে পরিবারে মা-বাবা, ভাই-বোন, দাদা-দাদি, চাচা-চাচি সবাই মিলেমিশে থাকতেন; এখন সেখানে স্বামী-স্ত্রী ও সন্তান মিলিয়ে ছোট পরিবার তৈরি হচ্ছে।

২. পরিবারের বয়স্ক সদস্যদের গুরুত্ব কমে যাচ্ছে। আগেকার সময় বয়স্ক সদস্যরা পরিবারের গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিতেন; এখন তাঁদের মতামতও অনেকে গ্রহন করে না।

৩. পশ্চিমা পরিবারে নারী-পুরুষের দায়িত্ব-কর্তব্য একই ধরনের। কিন্তু মুসলিম পরিবারে দায়িত্ব ভাগ করা থাকে। পুরুষ উপার্জন করবে, আর নারী ঘর-সংসার সামলাবে। কিন্তু এখন পশ্চিমা ধাঁচে মুসলিম পরিবারের অনেক নারীরাও চায় উপার্জন করতে।

৪. নারীদের ক্যারিয়ারমুখী করা হচ্ছে। কারণ, ক্যারিয়ার ছাড়া পরিবার বা সমাজে নিজের আত্মমর্যাদা কমে যাবে- এ ধরনের কথার্বাতা বেশ জোরালোভাবে সমাজে প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে।

৫. উচ্চশিক্ষা বা ক্যারিয়ারের জন্য দেরীতে বিয়ে করার প্রবণতা বেড়েছে।

৬. ডিভোর্সের হার বেড়েছে। আগে যেখানে দাম্পত্য সম্পর্ক ঝগড়া বা বনিবনা না হলে পরিবারের সদস্যদের জানিয়ে সমাধান করার চেষ্টা হতো; এখন আর সেটা তেমন হয়না। কোনো কিছু হলে মামলা অথবা ডিভোর্সে চলে যায় সবকিছু।

৭. সমতা বা সমান অধিকারের ফলে দাম্পত্য সম্পর্কে এক ধরণের প্রতিযোগিতা দেখা দেয়। এতে সম্পর্কের মধ্যে শান্তি কমে, ঝগড়া সৃষ্টি হয়।

৮. সন্তান লালন-পালনে কুরআন হাদিস অনুসরণ না করে পশ্চিমাদের দেখানো পদ্ধতি অনুসরণ করা হচ্ছে।

৯. পশ্চিমা মিডিয়ায় অনেক সময় হিজাবকে পিছিয়ে পড়া বা অপ্রয়োজনীয় হিসেবে দেখানো হয়। ফলে মেয়েরা পর্দার আসল উদ্দেশ্য ভুলে গিয়ে কেবল ফ্যাশনকে গুরুত্ব দেয়। আবার পরিবারে পর্দা মানার বিষয়ে মতবিরোধ দেখা দেয়—মা পর্দা চান, কিন্তু মেয়ে তা মানতে রাজি না। এতে পরিবারে ধর্মীয় পরিবেশ দুর্বল হয় এবং প্রজন্মগত পার্থক্য বাড়ে।

১০. সামাজিক যোগাযোগ-মাধ্যমে "কাপল ব্লগিং" এখন খুব জনপ্রিয়। এতে স্বামী-স্ত্রীর ব্যক্তিগত মুহূর্ত, ঝগড়া, আনন্দ সবকিছুই প্রকাশ করা হয়। মুসলিম পরিবারে যেসব বিষয় গোপন ও সম্মানের, সেগুলোও ভিডিও বা লাইভ স্ট্রিমের বিষয় হয়ে গেছে। এতে দাম্পত্য জীবনের গোপনীয়তা নষ্ট হচ্ছে। নারী-পুরুষের হায়া আর গায়রত কমে যাচ্ছে।

১১. প্রেম-ভালোবাসার সম্পর্ক এবং যৌনতা নিয়ে পশ্চিমা সংস্কৃতি খুবই স্বাধীন। এ স্বাধীনতা মুসলিম সমাজে ছড়িয়ে পড়ায় বিবাহব্যবস্থা কঠিন হয়ে যাচ্ছে।

১২. জীবনকে উপভোগ করতে গিয়ে অনেকে হারাম সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ছে। কেউ কেউ আবার বিয়ের পর পরকীয়ায় লিপ্ত হচ্ছে। অথচ এই দুইটা কাজ ভয়ংকর গুনাহ।

১৩. পশ্চিমা সংস্কৃতির ফলে পরিবারে গান-বাজনা, ফ্রী-মিক্সিং সবকিছু স্বাভাবিক হয়ে যাচ্ছে।

১৪. ক্যারিয়ার ও স্বাধীনতা নিয়ে পশ্চিমা ধারণা পুরুষদের পরিবার থেকে দূরে নিয়ে যাচ্ছে। পরিবারকে দায়িত্ব হিসেবে নয়, ঝামেলা হিসেবে দেখানো হচ্ছে। বাবা–মা বয়স্ক হলে তাদের দেখাশোনার দায়িত্ব নিতে অনেকে আগ্রহী হয় না। এতে পরিবারভিত্তিক দায়িত্ববোধ ও ভালোবাসা কমে যাচ্ছে।

১৫. পশ্চিমা উৎসব যেমন ক্রিসমাস, হ্যালোইন, নিউ ইয়ার—এসব এখন অনেক মুসলিম পরিবারেও পালন করা হচ্ছে।

১৬. পশ্চিমা বিভিন্ন দিবস যেমন- মা দিবস, বাবা দিবস, বিবাহবার্ষিকী, জন্মদিন ইত্যাদি পালন করা হচ্ছে।

১৭. পশ্চিমা দেশে উচ্চশিক্ষার জন্য কিংবা স্থায়ী বসবাসের জন্য যাওয়ার হার বৃদ্ধি পাচ্ছে।

১৮. সোশ্যাল মিডিয়ার কারণে পরিবারের ব্যক্তিগত মুহূর্ত প্রকাশ করার অভ্যাস বেড়েছে। সন্তানদের ঘুমানো, খাওয়া, কান্না—সবকিছুর ভিডিও বানানো হয়। এতে প্রাইভেসি নষ্ট হয়

এবং শিশুর ব্যক্তিগত জীবন ভবিষ্যতে ঝুঁকিতে পড়ে। পরিবার নিয়ে ট্রোল, সমালোচনা, গুজব—এসবও সম্পর্ক নষ্ট করতে পারে।

সর্বোপরি, নারীবাদী আন্দোলন এবং মিডিয়ার ফলে পশ্চিমা সংস্কৃতিকে বেশ সহজলভ্য হিসাবে উপস্থাপন করা হচ্ছে। তাদের সুযোগ-সুবিধা আর স্বাধীনভাবে থাকার দিকটি বেশি গুরুত্ব পাচ্ছে। পশ্চিমা জীবনধারা এই ব্যক্তিগত স্বাধীনতার কারণে অনেক পরিবারে মানসিক চাপ বাড়ছে।

অধ্যায় ৮

কুরআন-হাদিসের আলোকে পশ্চিমাদের অনুসরণ করারা ভয়াবহ পরিণতি

ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা। মুসলিমদের জীবন আল্লাহ ও তার রাসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নির্দেশ অনুযায়ী সাজাতে হবে। কিন্তু মুসলিমদের অধিকাংশই এখন পশ্চিমা স্রোতে গা ভাসিয়ে দিয়েছে। মুসলিমদেরে প্রায় প্রতিটি ঘরই পশ্চিমা ফেতনায় আক্রান্ত। পশ্চিমারা আল্লাহকে অমান্য করে, আল্লাহর অবাধ্যতায় সব সময় লিপ্ত থাকে। তাদের কাছে দুনিয়ার ভোগ-বিলাসীতাই সবকিছু।পশ্চিমা সংস্কৃতি যেখানে অশ্লীলতা, লজ্জাহীনতা, পারিবারিক ভাঙন, ধর্মহীনতা, নৈতিক শৈথিল্য ও ভোগবাদ এসবকে উন্নতি মানা হয়; যা মুসলিমদের জন্য মারাত্মক হুমকি।

কুরআন ও হাদিসে ইহুদি-নাসারা বলে যাদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে, তারা হলো এই পশ্চিমা জাতি। তাদেরকে অনুসরণ করার ব্যাপারে কুরআন-হাদীসে স্পষ্ট সতর্কতা আছে।

❖ পথভ্রষ্ট জাতিকে অনুসরণ করা সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'লা বলেন
"তোমরা তাদের পথ অনুসরণ করো না, যারা আগেই পথভ্রষ্ট হয়েছে এবং অন্যদেরকেও পথভ্রষ্ট করেছে।" [২৭]
»» আয়াতের তাফসীরে বলা হয়েছে,
"সত্যের অনুসরণ করতে গিয়ে সীমা অতিক্রম করো না। যাঁর সম্মান প্রদর্শন করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, তাঁর ব্যাপারে বাড়াবাড়ি ও অতিরঞ্জন করে তাঁকে আল্লাহর আসনে অধিষ্ঠিত করো না। যেমন ঈসা (আঃ)-এর ব্যাপারে তোমরা করেছ। অতিরঞ্জন সর্বযুগে শিরক ও ভ্রষ্টতার সব থেকে বড় উপকরণ হিসাবে দেখা গেছে। মানুষের মনে যাঁর প্রতি নিতান্ত বিশ্বাস ও ভালোবাসা আছে, সে তাঁর ব্যাপারে অতিরঞ্জন ও বাড়াবাড়ি করে থাকে। তিনি যদি ইমাম বা ধর্মীয় নেতা হন, তাহলে তাঁকে নবীদের মত নিষ্পাপ মনে করা এবং নবীদেরকে আল্লাহর গুণে গুণান্বিত করা তো সাধারণ ব্যাপার। দুর্ভাগ্যবশতঃ মুসলিমরাও এই অতিরঞ্জন থেকে মুক্ত নয়। তারাও কিছু ইমাম ও উলামার ব্যাপারে অতিরঞ্জন ও বাড়াবাড়ি করেছে যে, তাঁদের রায় ও উক্তি এমনকি তাঁদের প্রতি সম্পৃক্ত ফতোয়া এবং ফিকহকেও রসূল (সাঃ)-এর হাদীসের উপর অগ্রাধিকার প্রদান করেছে!
অর্থাৎ, পূর্ববর্তী লোকেদের পিছে পড়ো না, যারা এক নবীকে মা'বূদ বা উপাস্য বানিয়ে নিয়ে নিজেরা ভ্রষ্ট হয়েছে এবং অন্যদেরকেও ভ্রষ্ট করেছে।" [তাফসীরে আহসানুল বায়ান]

উপরোক্ত আয়াত সরাসরি বলা হয়েছে, যারা আল্লাহর বিধান মানে না, নিজেদের কামনা-বাসনার পেছনে চলে, তারা নিজেরা পথ হারায় এবং অনুসারীদেরও ভুল পথে নিয়ে যায়। পশ্চিমা সমাজে আল্লাহর হুকুম নেই; তাই তাদের অনুসরণ করলে মুসলিমরাও তাদের মতো বিপথগামী হবে। অর্থ্যাৎ পশ্চিমা আর তাদের অনুসারীদের একই গন্তব্যে। আর আল্লাহর অবাধ্যতা ও ধ্বংস তো আছে।

❖ আল্লাহ তা'লা আরো বলেন,

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُوْدَ وَالنَّصٰرٰٓي اَوْلِيَآءَ ۘۢ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَآءُ بَعْضٍ ؕ وَمَنْ يَّتَوَلَّهُمْ مِّنْكُمْ فَاِنَّهٗ مِنْهُمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ۝

অর্থ : হে মুমিণগণ! তোমরা ইহুদী ও খ্রীষ্টানদেরকে বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করো না। তারা একে অপরের বন্ধু। তোমাদের মধ্যে যে তাদের সাথে বন্ধুত্ব করবে, সে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ জালেমদেরকে পথ প্রদর্শন করেন না। [২৮]

»»উপরোক্ত আয়াতের তাফসীরে

❝ইহুদী ও খ্রিষ্টানদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করতে নিষেধ করা হয়েছে। কেননা তারা ইসলাম ও মুসলমানের শত্রু। যারা তাদের সাথে বন্ধুত্ব রাখবে তাদের জন্য কঠিন শাস্তির কথাও ঘোষণা করা হয়েছে যে, তারা তদেরই দলভুক্ত বলে গণ্য হবে।

প্রত্যেক মানুষ কুরআনে বর্ণিত এই প্রকৃতত্বকে লক্ষ্য করতে পারে যে, ইয়াহুদ ও খ্রিষ্টানরা তাদের পরষ্পরের মধ্যে আকীদাগত কঠিন মতভেদ এবং পরষ্পরের মধ্যে বিদ্বেষ ও শত্রুতা বিদ্যমান আছে; কিন্তু তা সত্ত্বেও ইসলাম ও মুসলিমদের বিরুদ্ধে তারা একে অপরের পৃষ্ঠপোষক ও সহায়ক।

এই আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার কারণ হিসাবে বলা হয় যে, উবাদা বিন স্বামেত আনসারী (রাঃ) এবং মুনাফিকদের সর্দার আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই দু'জনেই জাহেলিয়াতের যুগ থেকে ইয়াহুদীদের সাথে মৈত্রীচুক্তিতে আবদ্ধ ছিল। বদরের যুদ্ধে যখন মুসলিমগণ বিজয়ী হলেন, তখন আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই নিজেকে মুসলিম বলে প্রকাশ করল। এদিকে অল্প কিছু দিনের মধ্যেই বানু কাইনুকার ইয়াহুদীরা ফিতনার আগুন জ্বালিয়ে দিল এবং তা নির্বাপিত করা হল। এর ফলে উবাদা (রাঃ) ইয়াহুদীদের সাথে মৈত্রী-সম্পর্ক ছিন্ন করার কথা ঘোষণা করে দিলেন। কিন্তু আব্দুল্লাহ বিন উবাই বিপরীত পথ অবলম্বন করে ইয়াহুদীদেরকে বাঁচানোর জন্য সমস্ত রকম প্রচেষ্টা শুরু করে দিল। যার পরিপ্রেক্ষিতে এই আয়াত অবতীর্ণ হয়।❞ [তাফসীরে আহসানুল বায়ান]

❖মুসলিমদের দুনিয়া-আখিরাত দুইটা আছে। কিন্তু অমুসলিমদে জন্য দুনিয়াই সবকিছু; দুনিয়াতে সাফল্য অর্জন করা, আরাম-আয়েশ ভোগ করা একমাত্র লক্ষ্য। অথচ এই দুনিয়ার জীবনের চেয়ে অনন্ত আরেক জীবন যে আছে, সে ব্যাপারে তারা বেখেয়াল।

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ সুবাহান তা'লা বলেছেন,
وَمَا هٰذِهِ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَآ اِلَّا لَهْوٌ وَّلَعِبٌ ۗ وَاِنَّ الدَّارَ الْاٰخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ ۘ لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ
অর্থ : এই পার্থিব জীবন খেল-তামাশা ছাড়া কিছুই নয়। বস্তুত আখিরাতের জীবনই প্রকৃত জীবন; যদি তারা জানত। [২৯]

❖ব্যভিচার-জিনা সম্পর্কে আল্লাহ তা'লা সতর্ক করেছেন এবং তার শাস্তি উল্লেখ করে দিয়েছেন কুরআনে। আল্লাহ তা'লা বলেন,

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنٰٓي اِنَّهٗ كَانَ فَاحِشَةً ۗ وَسَآءَ سَبِيْلًا
অর্থ : আর ব্যভিচারের কাছেও যেয়ো না। নিশ্চয় এটা অশ্লীল কাজ এবং মন্দ পথ। [৩০]
»»আয়াতের তাফসীরে বলা হয়েছে,
“ইসলামে ব্যভিচার বড়ই অপরাধমূলক কাজ; এত বড় অপরাধ যে, কোন বিবাহিত পুরুষ অথবা মহিলার দ্বারা এ কাজ হয়ে গেলে, ইসলামী সমাজে তার জীবিত থাকার অধিকার থাকে না। আবার তাকে তরবারির এক আঘাতে হত্যা করাও যথেষ্ট হয় না, বরং নির্দেশ হল, পাথর মেরে মেরে তার জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটাতে হবে। যাতে সে সমাজে (অন্যদের জন্য) শিক্ষণীয় বিষয় হয়ে যায়। সেহেতু এখানে বলা হয়েছে, ব্যভিচারের কাছেও যেয়ো না। অর্থাৎ, তাতে উদ্বুদ্ধকারী উপায়-উপকরণ থেকেও দূরে থাক। যেমন, 'গায়ের মাহরাম' (যার সাথে বিবাহ হারাম নয় এমন বেগানা) নারীকে দেখা-সাক্ষাৎ করা, তার সাথে অবাধ মেলামেশার ও কথা বলার পথ সুগম করা। অনুরূপ মহিলাদের সাজ-সজ্জা করে বেপর্দার সাথে বাড়ী থেকে বের হওয়া ইত্যাদি যাবতীয় কার্যকলাপ থেকে দূরে থাকা জরুরী। যাতে এই ধরনের অশ্লীলতা থেকে বাঁচা যায়।” [তাফসীরে আহসানুল বায়ান]

❖ আবূ সা’ঈদ খুদরী (রাঃ) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেছেনঃ অবশ্য অবশ্যই তোমরা তোমাদের আগের লোকেদের নীতি-পদ্ধতিকে বিঘতে বিঘতে, হাতে হাতে অনুকরণ করবে। এমনকি তারা যদি দবের গর্তে ঢুকে, তাহলে তোমরাও তাদের অনুকরণ করবে। আমরা বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! এরা কি ইয়াহূদী ও নাসারা? তিনি বললেনঃ আর কারা? [৩১]

মুসলিমরা নিজেদের আদর্শ ত্যাগ করে ক্রমশ অমুসলিমদের নীতি পদ্ধতি গ্রহণ করছে। অশ্লীলতা, নাচ, গান, বাদ্য, নারীদের অধিকারের নামে উলঙ্গপনা, থার্টি ফাস্ট নাইট, ভেলেনটাইন ডে, সেকুলারিজম, ভাস্কর্যের নাম দিয়ে মূর্তি পূজার বিস্তৃতি, এক মিনিট নীরবতা, পার্টি পলিটিক্স, নারীদের বিজ্ঞাপন ইত্যাদি আজ মুসলিমদেরকে গ্রাস করে ফেলেছে। মুসলিমরা জুমার ফারয সালাত বাদ দিয়ে ক্রিকেট খেলা ও খেলা দেখাকে ফারয করে নিয়েছে। আজ মুসলিমরা অমুসলিমদের অনুগত গোলামের মত কাজ করছে।

❖ইবনু 'উমার রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:
"যে ব্যক্তি কোন সম্প্রদায়ের অনুসরণ-অনুকরণ করবে, সে তাদের দলভুক্ত হবে।" [৩২]
ব্যাখ্যা : নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ হাদীসে সংবাদ দিয়েছেন যে, যে ব্যক্তি কোন কাফির অথবা ফাসিক অথবা নেককার সম্প্রদায়ের অনুসরণ-অনুকরণ করবে- আর তা হলো তাদের আক্বীদা অথবা ইবাদত অথবা চাল-চলন ইত্যাদি বৈশিষ্ট্য ধারণ করবে, সে তাদের দলভুক্ত হবে। কেননা বাহ্যিক অনুকরণ মূলত অভ্যন্তরীণ ও মনের অনুসরণ-অনুকরণে পৌঁছে দেয়। নি:সন্দেহে কোন সম্প্রদায়ের অনুসরণ তাদের প্রতি আকৃষ্ট হওয়ার কারণে হয়ে থাকে। কখনও কখনও তা তাদের প্রতি ভালোবাসা, তাদেরকে সম্মান করা এবং তাদের প্রতি ঝুঁকে যাওয়া পর্যন্ত হয়ে থাকে। আর এসব বাহ্যিক অনুসরণ ব্যক্তিকে অভ্যন্তরীণ ও ইবাদতের দিকে নিয়ে যায়। আল্লাহর কাছে এসব থেকে পানাহ চাই।

পরিশেষে বলা যায়, পশ্চিমাদের যারা অনুসরণ করে তারা তাদের মতাদর্শে আদর্শিত হয়ে যায়। আর তাদের মতাদর্শ আমাদের কুরআন-সুন্নাহর সাথে সাংঘর্ষিক। এমন কোনো কিছু অনুসরণ যাবে না, যেগুলো আমাদের ঈমান-আমলকে নষ্ট করে দেয়। নিজের এবং মুসলিম উম্মাহর কল্যাণের জন্য পশ্চিমা সংস্কৃতির অনুসরণ-অনুকরণ থেকে দূরে থাকতে হবে।

অধ্যায় ৯

ইসলামের আলোকে পশ্চিমা সংস্কৃতির প্রতিকার, প্রতিরোধ ও সমাধান

আজকের যুগে পশ্চিমা সংস্কৃতি এমনভাবে ছড়িয়ে পড়েছে যে মুসলিম পারিবারিক কাঠামো থেকে সর্বত্র এর প্রভাব দেখা যাচ্ছে। পশ্চিমা সংস্কৃতির ঢেউ সোশ্যাল মিডিয়া, সিনেমা, ফ্যাশন, শিক্ষা, প্রযুক্তি, স্বাধীনতার ভুল ধারণা—সবকিছু দিয়ে মুসলিম পরিবারে প্রবেশ করেছে। এটি ধীরে ধীরে মুসলমানদের ঈমান, আকিদা, নৈতিকতা এবং পারিবারিক কাঠামোকে দুর্বল করছে।

ইসলামে স্পষ্টভাবে নির্দেশনা আছে যে মুসলমান অন্য জাতির অন্ধ অনুসরণ করবে না। কুরআন বলে:

ثُمَّ جَعَلْنٰكَ عَلٰي شَرِيْعَةٍ مِّنَ الْاَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ اَهْوَآءَ الَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ

অর্থ: এরপর আমি আপনাকে রেখেছি ধর্মের এক বিশেষ শরীয়তের উপর। অতএব, আপনি এর অনুসরণ করুন এবং অজ্ঞানদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করবেন না। [৩৩]

এখানে, شَرِيعَة শরীয়তের আভিধানিক অর্থ হলঃ রাস্তা, ধর্মাদর্শ, বিধান এবং নিয়ম-পদ্ধতি। রাজপথ বা 'মেনরোড'কেও شَارِع 'শারে' বলা হয়। কারণ, তা গন্তব্যস্থানে পৌঁছে দেয়। তাই শরীয়ত বলতে এখানে সেই দ্বীনের বিধানকে বুঝানো হয়েছে, যা আল্লাহ তাঁর বান্দাদের জন্য নির্দিষ্ট করেছেন। যাতে মানুষ সে পথে চলে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ করতে পারে।

ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা। ইসলামের নির্দেশনাগুলো শুধু ইবাদত নয়, বরং পরিবার-সমাজ, সংস্কৃতিসহ সব ক্ষেত্রেই পথ প্রদর্শন করে।
ইসলাম একটা সুশৃঙ্খল, পরিপাটি, সাজানো-গোছানো জীবনপদ্ধতি।

পরিবারের সবার সাথে ভালো ব্যবহার করা, গরিব-এতিমের সাথে ভালো আচরণ করা, সমাজের একে অন্যের খোঁজ খবর নেওয়া সব ক্ষেত্রেই ইসলামের গুরুত্ব অনস্বীকার্য। প্রতিবেশীর হক আদায়, তাদের খোঁজ খবর নেওয়া থেকে শুরু করে দৈনন্দিন কাজে সাহায্য করা, রোগ শোকে পাশে থাকা ইত্যাদি কাজের নির্দেশনা দেয় ইসলাম। ইসলামই নারীকে সর্বোচ্চ মর্যাদার অধিকারী করেছে। নারীর অধিকার রক্ষায় পুরুষ সবসময়ই সোচ্চার থাকবে। পরিপূর্ণ ইসলামে প্রবেশ করলে মানুষের ইহকালে ও পরকালে মুক্তি মিলবে।

বর্তমান সময়ে পশ্চিমা সংস্কৃতির প্রচার-প্রসারে মুসলিমদের ধর্মীয় মূল্যবোধ থেকে শুরু করে চারিত্রিক শালীনতার দিকও অবক্ষয় হচ্ছে।
রাসূল ﷺ সতর্ক করে বলেছেন:
“যে ব্যক্তি কোন সম্প্রদায়ের অনুসরণ-অনুকরণ করবে, সে তাদের দলভুক্ত হবে।” [৩৪]

এই হাদিস থেকে বুঝা যায়— পশ্চিমা সংস্কৃতির অন্ধ অনুকরণ শুধু সামাজিক ক্ষতি নয়; বরং ঈমানের জন্য ক্ষতিকর। তাই ইসলামের নির্দেশ অনুযায়ী প্রতিরোধ ও সমাধান জরুরি।

প্রথমত, আকিদাগত প্রতিরোধ (চিন্তা ও বিশ্বাস) করতে হবে

আকিদা অর্থ হলো বন্ধন করা, গিরা দেওয়া, চুক্তি করা, শক্ত হওয়া ইত্যাদি। আকিদা মানুষের এমন কতোগুলো অভ্যাসকে বলা হয়, যা তারা মনে-প্রাণে গ্রহণ করে এবং তার উপর জান-প্রাণ দিতে অটল থাকে। আমাদের আকিদাকে ঠিক করে, ভিন্ন জাতির আকিদা অর্থ্যাৎ পশ্চিমাদের চিন্তা-দর্শন, উন্নতি ইত্যাদি প্রতিরোধ করতে হবে। ইসলামি পরিচয়কে শক্তিশালী করতে হবে। পশ্চিমা সংস্কৃতির সবচেয়ে বড় ক্ষতি চিন্তায় ঘটে। মুসলমান নিজের পরিচয় ভুলে গেলে, পশ্চিমারাই তার রোল মডেল হয়ে যায়। অথচ মুসলমানের পরিচয় হলো আল্লাহর ধর্ম, আল্লাহর বিধান, নবীর আদর্শ।

পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে,

صِبْغَةَ اللّٰهِ ۚ وَمَنْ اَحْسَنُ مِنَ اللّٰهِ صِبْغَةً ۫ وَّنَحْنُ لَهٗ عٰبِدُوْنَ

অর্থ : আমরা আল্লাহর রং গ্রহণ করেছি। আল্লাহর রং এর চাইতে উত্তম রং আর কার হতে পারে?আমরা তাঁরই এবাদত করি। [৩৫]

আয়াতে রং এর ভাবার্ত হচ্ছে ধর্ম।
»»উক্ত আয়াতের তাফসীরে বলা হয়েছে,
❝খ্রিষ্টানদের কাছে এক প্রকার হলুদ রঙের পানি থাকে; যা প্রত্যেক খ্রিষ্টান শিশুকে এবং প্রত্যেক সেই ব্যক্তিকে পান করানো হয়; যাকে খ্রিষ্টান বানানো উদ্দেশ্য হয়। এই অনুষ্ঠানের নাম তাদের নিকট 'ব্যাপ্টিজম' (পবিত্র বারি দ্বারা অভিসিঞ্চিত করে খ্রিষ্টধর্মের দীক্ষাদানোৎসব)। এটা তাদের নিকট অত্যধিক জরুরী ব্যাপার। এ ছাড়া তারা কাউকেও পবিত্র গণ্য করে না। মহান আল্লাহ তাদের এ বিশ্বাস খন্ডন করে বলেন, আসল রঙ তো আল্লাহর রঙ। এর চেয়ে উত্তম কোন রঙ নেই। আর আল্লাহর রঙের তাৎপর্য হল, প্রাকৃতিক

ধর্ম ইসলাম, যার প্রতি প্রত্যেক নবী নিজ নিজ যুগে সব সব উম্মতকে আহবান করেছেন; যা ছিল তাওহীদের আহবান।” [তাফসীরে আহসানুল বায়ান]

দ্বিতীয়ত, নৈতিক প্রতিরোধ করতে হবে

নৈতিক প্রতিরোধ বলতে হায়া, গায়রত ও চরিত্র ইসলাম হায়াকে শুধু একটি গুণ নয়, বরং ঈমানের অংশ হিসেবে ঘোষণা করেছে। হায়া থাকলে মানুষ আল্লাহকে ভয় করে, অশ্লীলতা থেকে দূরে থাকে এবং চরিত্র সুন্দর করে।

রাসূল ﷺ বলেছেন,

আবূ হুরায়রাহ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, ঈমানের শাখা সত্তরটিরও কিছু বেশি। অথবা ষাটটির কিছু বেশি। এর সর্বোচ্চ শাখা হচ্ছে (আল্লাহ ব্যতীত প্রকৃত কোন ইলাহ নেই) এ কথা স্বীকার করা, আর এর সর্বনিম্ন শাখা হচ্ছে রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু সরিয়ে ফেলা। আর লজ্জা ঈমানের একটি বিশেষ শাখা। [৩৬]

আল্লাহ তা'লা মুমিন-নারী পুরুষকে তাদের দৃষ্টি নিচু রাখতে এবং যৌণাঙ্গের হেফাজত করতে নির্দেশ দিয়েছেন। আর নারীরা যেনো তাদের সৌন্দর্য্য পর-পুরুষের সামনে প্রকাশ না করে সে বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে। 'হায়া' মুমিন নারী-পুরুষের গুণ। তারা কখনোই তাদের হায়া বিসর্জন দিয়ে অশ্লীলতায় লিপ্ত হবে না।

গায়রতের গুরুত্ব সম্পর্কে রাসূল ﷺ বলেছেন:
“আল্লাহ গায়রতময়, আর তিনি গায়রত ভালোবাসেন।” [৩৭]

আল্লাহ তা'লা মুমিন-নারী পুরুষকে তাদের দৃষ্টি নিচু রাখতে এবং যৌণাঙ্গের হেফাজত করতে নির্দেশ দিয়েছেন। আর নারীরা যেনো তাদের সৌন্দর্য্য পর-পুরুষের সামনে প্রকাশ না করে সে বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে। 'হায়া' আর 'গায়রত' মুমিন নারী-পুরুষের গুণ। তারা কখনোই তাদের হায়া আর গায়রত বিসর্জন দিয়ে অশ্লীলতায় লিপ্ত হয় না।
একজন মুসলমি পুরুষ তার স্ত্রী-সন্তান ও পরিবারের ইজ্জত–সম্মান রক্ষায় সর্বদা সতর্ক থাকবে।

পশ্চিমা সংস্কৃতিতে আছে— ছেলে মেয়েদের বন্ধুত্ব, ফ্রী মিক্সিং পরিবেশ, উন্মুক্ত পোশাক, পর্দাহীন জীবন, অশ্লীল বিনোদন, হারাম সম্পর্কসহ আরো অনেক অশ্লীলতা। একজন মুসলিমের উচিত নিজের গায়রত আর হায়া ঠিক রেখে এসব অশ্লীলতা থেকে দূরে থাকা।

আমাদেরকে পরিপূর্ণভাবে ইসলামে প্রবেশ করতে হবে। আল্লাহ সুবাহান তা'লা সূরা বাকরাহর ২০৮ নং আয়াতে বলেন,

তৃতীয়ত, পরিবারে ইসলামিক পরিবেশ তৈরি করা

পরিবারে যে পরিবেশ থাকে, সেই পরিবেশই সবাই শিখবে। যদি পশ্চিমা লাইফ-স্টাইল নিয়ে বেশি কথাবার্তা বা ফোকাস করা হয়, তাহলে পরিবারের অন্য সদস্যদের আচার-আচরণেও তা কিছুটা ফুটে উঠবে। আর পরিবার যদি হয় ইসলামিক অর্থ্যাৎ ইসলামী অনুসাশনে রাসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সুন্নাহ মোতাবেক চলে তাহলে তার প্রভাবও দেখা যাবে পরিবারের সদস্যদের মধ্যে। আমাদের জন্য রাসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হচ্ছেন উত্তম আদর্শ। উনার গোটা জীবনিটা কেয়ামতের আগ পর্যন্ত আমাদের জন্য অনুসরণীয়। রাসুলের আদর্শে জীবন অতিবাহিত করলে দুনিয়া-আখিরাতে শান্তি।

পরিবারে ইসলামি পরিবেশ তৈরি করতে যা যা করতে পারি :-

১. ঘরে নিয়মিত কুরআন তেলাওয়াত করা। পরিবারে নিয়মিত কুরআন তিলাওয়াত চালু রাখলে ঘরে বরকত আসে।

২. ছোট শিশুদের ছোটবেলা থেকে কুরআন তেলাওয়াত শুনানো ও শেখানো। তাদের হৃদয়ে আল্লাহর ভালোবাসা ও রাসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সুন্নাহর বীজ রোপণ করে।

৩. পরিবারে নামাজের পরিবেশ তৈরি করা। পুরুষ সদস্যরা মসজিদে জামাতে নামাজ পড়বে, আর মহিলারা ঘরে নামাজ পড়বে। ছোট বাচ্চাদেরকেও নামাজের সময় পাশে রাখে, যাতে তারা নামাজ দেখে শিখতে পারে।

৪. ঘরে গান-বাজনা, মুভি-সিরিয়াল না দেখা। যা হারাম তা সর্বাবস্থায় ত্যাগ করা।

৫. পরিবারের সবাই শালীন-মার্জিত পোশাক পড়া।

৬. ইসলামিক বই পড়া, তালিম করা।

৭. পরিবারের প্রত্যেক সদস্য একে-অপরকে সালাম করা। কারণ, সালাম শান্তি বর্ষিত করে।

৮. পরিবারের বড়দেরকে সম্মান আর ছোটদেরকে স্নেহ করা। উত্তম আখলাকের গুণাবলী অর্জন করা।

তাছাড়া পশ্চিমা বা বিদর্মীদের অনুসরণ করে পোশাক পড়া যাবে না, চুল কাটা যাবে না, বিভিন্ন দিবস যেমন- মা দিবস, বাবা দিবস, জন্মদিন, বিবাহ বার্ষিকী ইত্যাদি পালন করা যাবেনা।
আল্লাহ তা'লা পবিত্র কুরআনে বলেছেন,

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قُوْۤا اَنْفُسَكُمْ وَاَهْلِيْكُمْ نَارًا وَّقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلٰۤئِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَّا يَعْصُوْنَ اللّٰهَ مَاۤ اَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُوْنَ مَا يُؤْمَرُوْنَ

অর্থ : মুমিনগণ, তোমরা নিজেদেরকে এবং তোমাদের পরিবার-পরিজনকে সেই অগ্নি থেকে রক্ষা কর, যার ইন্ধন হবে মানুষ ও প্রস্তর, যাতে নিয়োজিত আছে পাষাণ হৃদয়, কঠোরস্বভাব ফেরেশতাগণ। তারা আল্লাহ তা'আলা যা আদেশ করেন, তা অমান্য করে না এবং যা করতে আদেশ করা হয়, তাই করে। [৩৮]

»»আয়াতের তাফসীরে বলা হয়েছে,
“মু'মিনদের পালনীয় অতি গুরুত্বপূর্ণ একটি দায়িত্বের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। আর তা হল, নিজেদেরকে সংস্কার ও সংশোধন করার সাথে সাথে পরিবারের লোকদেরকেও সংস্কার ও সংশোধন করতে হবে এবং তাদেরকে ইসলামী শিক্ষা ও তরবিয়ত দেওয়ার প্রতি যত্নবান হতে হবে। যাতে তারা জাহান্নামের জ্বালানী হওয়া থেকে বেঁচে যায়। আর এই কারণেই রসূল (সাঃ) বলেছেন, "শিশুরা যখন সাত বছর বয়সে পৌঁছে যাবে, তখন তাদেরকে নামায পড়ার আদেশ দাও। আর দশ বছর বয়সে পৌঁছে যাওয়ার পর (তারা নামাযের ব্যাপারে উদাসীন হলে) তাদেরকে (শিক্ষামূলক) প্রহার কর।" (সুনানে আবূ দাউদ, সুনানে তিরমিযী নামায অধ্যায়) ফক্বীহগণ বলেন, এইভাবে তাদেরকে রোযা রাখারও আদেশ দিতে হবে এবং অন্যান্য শরীয়তী বিধি-বিধানের অনুসরণ করার শিক্ষা তাদেরকে দিতে হবে। যাতে সাবালক হওয়ার সাথে সাথে তাদের মধ্যে সত্য দ্বীন মানার অনুভূতি সৃষ্টি হয়ে যায়।**”** [তাফসীরে ইবনে কাসীর]

চর্তুথত, বিয়েকে সহজ করা

বিয়ে শুধুমাত্র দুইজ ব্যক্তির সম্পর্ক নয়, বরং পরিবার ও সমাজের নৈতিকতা ও নিরাপত্তার মূল ভিত্তি। বিয়েতে দেরি হলে সমাজে ফিতনা ও অনৈতিক সম্পর্ক বেড়ে যাবে। আর বর্তমানে এটা হচ্ছেও, দেরীতে বিয়ের ফলে অনৈতিক সম্পর্ক আর পাপাচার বাড়ছে।

পশ্চিমা সংস্কৃতি আজকের মুসলিম সমাজে বিয়ের জন্য অনেক বাঁধা তৈরি করছে।

ইসলাম স্পষ্টভাবে নির্দেশ দেয়—
হালালকে সহজ করার, আর হারামকে কঠিন করার। যখন বিয়ে সহজ করা হবে, তখন মানুষ হারাম সম্পর্ক থেকে দূরে থাকবে। তাই বিয়েকে সহজ করার ব্যাপারে সবাই সচেতন থাকতে হবে। বিশেষত, অধিক খরচ আর বিধর্মীদের দেখানো রীতিনীতি যেমন- এ্যানগেজমেন্ট, গায়ে হলুদ, প্রি-ওয়েডিং পার্টি, ব্রাইড টু বি পার্টি, কয়েকশো বরযাত্রী বা মানুষকে খাওয়ানো ইত্যাদি পরিহার করতে হবে। বিয়ে হবে সুন্নাহ মতো, কম খরচ, নগদ মোহর আর ওয়ালিমার মাধ্যমে।

পঞ্চমত, আত্মশুদ্ধি - ঈমান ঠিক রাখা ও ইবাদাত বৃদ্ধি

ঈমান : ঈমান শব্দের আভিধানিক অর্থ বিশ্বাস করা। আর ইসলামি পরিভাষায় ঈমান হলো আল্লাহ, তাঁর ফেরেশতাগণ, আসমানী কিতাবসমূহ, রসূলগণ, শেষ দিবস এবং ভাগ্যের ভাল-মন্দের প্রতি বিশ্বাস করা, মুখে স্বীকার করা এবং এর দাবি মোতাবেক আমল করা।
সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ হলো ঈমান। ঈমানের বিপরীত কুফর। ঈমান সত্য, কুফর মিথ্যা। ঈমান পূর্ণ কল্যাণ আর কুফর পূর্ণ অকল্যাণ। ঈমান সরলপথ, আর কুফর ভ্রষ্টতার রাস্তা।

ঈমান সৎকাজের দ্বারা বাড়ে এবং অসৎকাজের দ্বারা কমে। পরিবার, সমাজসহ সবকিছু ঠিক রাখতে গেলে প্রথম কাজ হলো ব্যক্তির নিজের ঈমানকে শক্ত করা।
আত্মশুদ্ধি : তাসাউফ, তাযকিয়া, তরিকত, ইহসান ইত্যাদি শব্দগুলো বাংলা অর্থ দাড়ায় আত্মশুদ্ধি। আত্মশুদ্ধি মানে অন্তরকে পাক-পবিত্র করা। অন্তরকে সর্ব প্রকার চারিত্রিক ও আত্মিক রোগ-ব্যধি থেকে পবিত্র রাখার জন্য এই আত্মশুদ্ধির প্রয়োজন হয়। যার মূল কথা হলো, ভিতর-বাহিরকে নেক আমল দ্বারা সজ্জিত করা এবং বদ আমল ও গুনাহ থেকে বাঁচিয়ে রাখা।
একজন মানুষ নিজের ভেতর পরিশুদ্ধতা আনতে না পারলে, সে পরিবারকেও ঠিকভাবে নেতৃত্ব দিতে পারবে না। তাই ইসলাম সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেয়—নিজেকে ঠিক করার ওপর, যাকে বলা হয় আত্মশুদ্ধি বা তাজকিয়া।

ইসলামে আত্মশুদ্ধি শুধু একটি ভালো গুণ নয়; বরং এটি সফল জীবনের মূল ভিত্তি।
কুরআনে আল্লাহ তায়ালা বলেন,

قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَكّٰىهَا

অর্থ : “নিশ্চয় সে-ই সফল, যে নিজের আত্মাকে পরিশুদ্ধ করল।” [৩৯]

অর্থাৎ, যে আত্মাকে শিরক, অবাধ্যতা থেকে এবং চারিত্রিক অশ্লীলতা থেকে পবিত্র করবে, সে পরকালে সফলতা ও মুক্তি লাভ করবে।

তাফসিরের ব্যাখ্যায় মুফাসসিরগণ বলেছেন—

- "নিজেকে পরিশুদ্ধ করা" মানে পাপ থেকে দূরে থাকা, গুনাহের রাস্তা বন্ধ করা।
- নামাজ, দোয়া, আল্লাহর ভয় ও লজ্জা (হায়া) দিয়ে নিজের মনকে পরিষ্কার করা।
- নিজের নফস ও খারাপ প্রবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রণ করা।

আত্মশুদ্ধির ফলে মানুষের চরিত্র সুন্দর হয়, আমলে ইখলাস আর আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল বাড়ে।

ইবাদত বৃ্দ্ধি : ইবাদত বৃদ্ধি মানে নামাজ, রোজা, কুরআন তেলাওয়াত, দোয়া, তাওবা ইত্যাদির পরিমান বাড়ানোকে বুঝানো হয়।

ইবাদতের হকদার একমাত্র আল্লাহ তা'য়ালা। আল্লাহ সুবাহান তা'লা জ্বিন ও ইনসান জাতিকে অযথা সৃষ্টি করেন নাই। বরং তাদের সৃষ্টি করেছেন একমাত্র আল্লাহর ইবাদত করার জন্য। তারা একমাত্র তাঁরই ইবাদত করবে, তাঁরই মহত্ব গাইবে এবং তাঁরই আনুগত্য করবে। তাঁর নির্দেশসমূহ মানবে এবং নিষেধসমূহ ত্যাগ করবে। তাঁর দেয়া সীমারেখা লঙ্ঘন করবে না। আর অন্য সবার ইবাদত ত্যাগ করবে। যেমন: আল্লাহ তা'য়ালা এরশাদ করেন:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُوْنِ

অর্থ : "আমি জ্বিন ও ইনসানকে একমাত্র আমার ইবাদতের জন্যই সৃষ্টি করেছি।" [৪০]

মোটকথা, আল্লাহ তা'আলা স্বীয় বান্দাদেরকে একমাত্র তাঁরই ইবাদতের জন্যে সৃষ্টি করেছেন। সুতরাং যে ব্যক্তি শুধুমাত্র তাঁরই ইবাদত করবে এবং তার সাথে অন্য কাউকেও শরীক করবে না তাকে তিনি উত্তম ও পূর্ণ পুরস্কার প্রদান করবেন। আর যারা তার সাথে অন্য কাউকেও শরীক করবে তাকে তিনি জঘন্য শাস্তি প্রদান করবেন। আল্লাহ তা'আলা কারো মুখাপেক্ষী নন, বরং সমস্ত মাখলুক সর্বাবস্থায় এবং সর্বসময় তাঁর পূর্ণ মুখাপেক্ষী।
ইবাদত বাড়লে পরিবার-সমাজ উপকৃত হয়।

- বাবা-মা ইবাদতকারী হলে সন্তানরাও ইবাদতগুজার হয়।
- পরিবারে ঝগড়া কমে, দয়া–ভালোবাসা বাড়ে।

• অপসংস্কৃতি, অশ্লীলতা, সম্পর্কের অবক্ষয়—এসব দূরে থাকে।
• মানুষ ফিতনা থেকে নিরাপদ থাকে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,
“দোয়া ইবাদতের মূল।” [৪১]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেছেন,
"যে ব্যক্তি মহান আল্লাহর নিকট দোয়া করে না, আল্লাহ তার প্রতি অসন্তুষ্ট হন।" [৪২]
অর্থাৎ যে আল্লাহকে বেশি ডাকবে, আল্লাহর সাথে তার সম্পর্ক ততো বেশি মজবুত হবে। যার সম্পর্ক আল্লাহর সাথে মজবুত, সে গুনাহ জড়ায় না, ফিতনায় পড়ে না। কারণ তাকে আল্লাহ তা'লা হেফাজতে রাখেন।

বর্তমান সময়ে, পশ্চিমা সংস্কৃতির প্রভাব মুসলিম পরিবারের জীবনযাত্রায় গভীরভাবে প্রভাব ফেলেছে। পরিবারকে সুস্থ রাখার জন্য প্রয়োজন নিজের ধর্মীয় পরিচয়কে আঁকড়ে ধরা, পরিবারে ঈমানি পরিবেশ বজায় রাখা,
হায়া-গায়রতের মূল্যবোধ জাগ্রত রাখা এবং ইসলামি শিক্ষার উপর দৃঢ় থাকা। পাশাপাশি মসজিদে এবং আলেম-উলামাদের সহবতে থাকা। ইতিহাস প্রমাণ করে, যখন মুসলমানরা নিজেদের মূল্যবোধে অটল থেকেছে, তখন কোনো বাহ্যিক সংস্কৃতি তাদের পরিচয় পরিবর্তন করতে পারেনি। তাই আজও পশ্চিমা সংস্কৃতি থেকে মুক্তির পথ একই; ইসলামি নৈতিকতা ও মজবুত পারিবারিক কাঠামো আঁকড়ে ধরে শান্তিপূর্ণ জীবন গঠন করা।

আংশিক ইসলাম আর আংশিক পশ্চিমাদের অনুসরণ করা চলবে না। পরিপূর্ণভাবে ইসলামকে আঁকড়ে ধরতে হবে। আল্লাহ সুবাহান তা'লা সূরা বাকারাহ’র ২০৮নং আয়াতে বলেন,
يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا ادْخُلُوْا فِي السِّلْمِ كَآفَّةً ۪ وَلَا تَتَّبِعُوْا خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ ؕ اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ
অর্থ : হে ঈমানদারগণ! তোমরা পরিপূর্ণভাবে ইসলামের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাও এবং শয়তানের পদাংক অনুসরণ কর না। নিশ্চিত রূপে সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।

»» তাফসীরে মারেফুল কুরআন মোতাবেক আয়াতটির তাফসীর হলো,
“হে ঈমানদারগণ, তোমরা পরিপূর্ণভাবে ইসলামের অন্তর্ভুক্ত হও। (ইহুদী ধর্মেরও কিছুটা পক্ষপাতিত্ব করবে এমন নয়) এবং (এমন কোন ধারণার বশবর্তী হয়ে) শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না। নিশ্চয়ই সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু। (সে মনের উপর এমনই পট্টি

পরিয়ে দেয়, যাতে কোন কোন বিষয় আপাতদৃষ্টিতে যথার্থ ধর্ম বলে মনে হলেও প্রকৃতপক্ষে তা সম্পূর্ণ ধর্মবিরোধী হয়ে থাকে। বস্তুত তোমাদের কাছে ইসলামী সংবিধানের প্রকৃষ্ট প্রমাণাদি উপস্থিত হওয়ার পরে যদিও সিরাতে মুস্তাকীম বা সরল পথ থেকে) তোমাদের পদস্খলন ঘটে, তাহলে নিশ্চিত জেনো, আল্লাহ্ তা'আলা (বড়ই) পরাক্রমশালী, (তোমাদের কঠিন শাস্তি দেবেন, অবশ্য সে শাস্তি যদি কিছুকাল নাও দেন, তাতে তোমরা ধোঁকায় পড়ো না। কারণ) তিনি বিজ্ঞ বটে। (বিশেষ কারণেও অনেক সময় শাস্তি দানে বিলম্ব করেন। মনে হয়) এরা (যারা প্রকৃষ্ট দলীল-প্রমাণ সত্ত্বেও সত্য পথ থেকে বিমুখতা অবলম্বন করে) শুধু সেই নির্দেশেরই অপেক্ষা করে আছে যে, আল্লাহ্ এবং ফেরেশতাগণ মেঘের শামিয়ানায় করে (তাদের শাস্তি দেওয়ার জন্য) তাদের কাছে আসবেন এবং গোটা বিষয়টির যবনিকাপাত ঘটে যাবে। (অর্থাৎ তারা এমন সময়ে সত্য বিষয়টি গ্রহণ করতে চায়, যখন তাদের সেই গ্রহণ করা গ্রাহ্যই হবে না ?) আর (শাস্তি ও প্রতিদানের) সমস্ত বিচার আল্লাহর দরবারে শেষ করা হবে। (অন্য কোন ক্ষমতাবান তখন থাকবে না। কাজেই এহেন পরাক্রমশালীর বিরুদ্ধাচরণের পরিণতি অকল্যাণ ছাড়া আর কি হতে পারে ?)

سِلْمِ - ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً

শব্দটি যের ও যবরসহযোগে (সিল্ম ও সাল্ম') দুটি পৃথক পৃথক অর্থে ব্যবহৃত হয়। একটির অর্থ হচ্ছে 'শান্তি', অপরটি 'ইসলাম'। এখানে অধিকাংশ সাহাবায়ে কেরামের মতে ইসলাম অর্থেই শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে।—(ইবনে কাসীর)। كَافَّةً শব্দটি 'পরিপূর্ণভাবে এবং সাধারণভাবে' এই দুই অর্থেই ব্যবহৃত হয়ে থাকে। ব্যাকরণের রীতি অনুযায়ী এখানে বাক্যটির গঠন হচ্ছে অবস্থাজ্ঞাপক। এতে দু'টি সম্ভাবনা রয়েছে, একটি হচ্ছে। ادْخُلُوا (তোমরা অন্তর্ভূক্ত হয়ে যাও) শব্দে যে সর্বনাম রয়েছে, তার অবস্থা জ্ঞাপন করছে অথবা ইসলাম অর্থে سِلْمِ শব্দটির অবস্থা জ্ঞাপন করছে। প্রথম ক্ষেত্রে অনুবাদ দাঁড়াবে এই যে— তোমরা সম্পূর্ণভাবে ইসলামের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাও অর্থাৎ তোমাদের হাত-পা, চোখ-কান, মন-মস্তিষ্ক সব কিছুই যেন ইসলামের আওতায় এবং আল্লাহর আনুগত্যের মধ্যে এসে যায়, এমন যেন না হয় যে, হাত-পা এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের দ্বারা ইসলামের বিধানসমূহ পালন করে যাচ্ছে, অথচ তোমাদের মন-মস্তিষ্ক তাতে সন্তুষ্ট নয় কিংবা মন-মস্তিষ্ক ইসলামের অনুশাসনে সন্তুষ্ট বটে, কিন্তু হস্ত-পদাদি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ক্রিয়াকলাপ তার বিরুদ্ধে।

দ্বিতীয় ক্ষেত্রে আয়াতটির অনুবাদ এই যে, তোমরা পূর্ণাঙ্গ ইসলামের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাও অর্থাৎ এমন যাতে না হয় যে, ইসলামের কিছু বিষয় মেনে নিলে আর কিছু মানতে গিয়ে গড়িমসি করতে থাকলে। তাছাড়া কোরআন ও সুন্নাহয় বর্ণিত পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধানের নামই হচ্ছে ইসলাম। কাজেই এর সম্পর্ক বিশ্বাস ও ইবাদতের সাথেই হোক কিংবা আচার-অনুষ্ঠান, সামাজিকতা অথবা রাষ্ট্রের সাথেই হোক কিংবা রাজনীতির সাথে হোক, এর সম্পর্ক বাণিজ্যের সাথেই হোক কিংবা শিল্পের সাথে—ইসলাম যে পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা দিয়েছে, তোমরা তারই অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাও।

এতদুভয় দিকের মূল প্রতিপাদ্যই মোটামুটিভাবে এই যে, ইসলামের বিধানসমূহ তা মানব জীবনের যে কোন বিভাগের সাথেই সম্পৃক্ত হোক না কেন, যে পর্যন্ত তার সমস্ত বিধি-নিষেধের প্রতি সত্যিকারভাবে স্বীকৃতি না দেবে, সে পর্যন্ত মুসলমান যোগ্যতা অর্জন করতে পারবে না ।

এ আয়াতের যে শানে-নুযুল উপরে বলা হয়েছে, মূলত তার মূল বক্তব্য এই যে, শুধুমাত্র ইসলামের শিক্ষাই তোমাদের উদ্দেশ্য হতে হবে। একে পরিপূর্ণভাবে গ্রহণ করে নিলে সে তোমাদেরকে অন্য সমস্ত ধর্মের প্রভাব থেকে মুক্ত করে দেবে।

সতর্কতাঃ যারা ইসলামকে শুধু মসজিদ এবং ইবাদতের মাঝে সীমাবদ্ধ করে দিয়েছে, সামাজিক আচার-ব্যবহারকে ইসলামী সংবিধানের অন্তর্ভুক্ত বলে মনে করে না, তাদের জন্য এই আয়াতে কঠিন সতর্কবাণী উচ্চারণ করা হয়েছে। তথাকথিত দীনদারদের মধ্যেই ক্রুটি বেশির ভাগ দেখা যায়। এর দৈনন্দিন আচার-আচরণ, বিশেষত সামাজিকতার ক্ষেত্রে পারস্পরিক যে অধিকার রয়েছে, সে সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ। মনে হয় এরা যেন এসব রীতিনীতিকে ইসলামের নির্দেশ বলেই বিশ্বাস করে না। তাই এগুলো জানতে-শিখতেও যেমন এদের কোন আগ্রহ নেই, তেমনিভাবে এর অনুশীলনেও তাদের কোন আগ্রহ নেই। নাউযুবিল্লাহ ! অন্ততপক্ষে হাকীমুল-উম্মত হযরত আশরাফ আলী থানবী (র) রচিত 'আদাবে মো'আশিরাত' পুস্তিকাটি পড়ে নেওয়া প্রতিটি মুসলমানের উচিত।

আল্লাহ ও ফেরেশতা মেঘের আড়ালে করে তাদের নিকট আগমন করবেন, এমন ঘটনা কিয়ামতের দিন সংঘটিত হবে। এমনিভাবে আল্লাহর আগমন দ্ব্যর্থবোধক বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত। এ সম্পর্কে অধিকাংশ সাহাবী, তাবেয়ী ও বুযুর্গানে দীনের রীতি হচ্ছে, বিষয়টিকে সঠিক ও

সত্য বলে বিশ্বাস করে নেওয়া, কিন্তু কিভাবে তা সংঘটিত হবে, তা জানার প্রয়োজন নেই। কেননা, আল্লাহর অস্তিত্ব ও তাঁর সমস্ত গুণাবলী ও অবস্থা জানা মানুষের ক্ষমতার ঊর্ধ্বে।”

উপসংহার

ইসলামী সমাজ ব্যবস্থার মূল ভিত্তি হলো পরিবার। আর আদর্শ পরিবার পরিচালনা করা যায় রাসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সুন্নাহকে অনুসরণ করে। আধুনিকতার যুগে চারিদিকে অনেক ফেতনা ঘাপটি মেরে আছে। সবচেয়ে বড় ফেতনা 'পশ্চিমাদের ফেতনা'। পশ্চিমা সংস্কৃতির নানা দিক যেমন - বিনোদন, মিডিয়া, চলচ্চিত্র, ফ্যাশন, নারীবাদ, হিউম্যানিজম, সেক্যুলারিজম, সমকামিতা, ব্যক্তি স্বাধীনতার নামে অশ্লীলতা ইত্যাদি ধীরে ধীরে মুসলিম সমাজে ঢুকে পড়েছে। সবচেয়ে বড় আগ্রাসন হলো, তারা তাদের সংস্কৃতিকে 'উন্নত, মর্ডান(আধুনিক)' বলে প্রচার করে; আর মুসলিম সংস্কৃতিকে 'পিছিয়ে থাকা, রক্ষণশীল, সেকালে' বলে তুলে ধরে। মুসলিম পারিবারিক কাটামো বা সমাজকে 'পুরুষতান্ত্রিক' বলে অভিহিত করে। মুসলিম নারীরা পিছিয়ে আছে, 'পর্দা-বোরকা-নেকাব' নারীদের স্বাধীনতা ও সাফল্যের বাধা বলে মিথা প্রোগাপান্ডা ছড়ায়। আর এই মানসিক আক্রমণই পরিবারে সবচেয়ে বেশি প্রভাব ফেলে, কারণ মানুষ যখন নিজের মূল্যবোধকে হীন ভাবে, তখন স্বভাবতই অন্যদের অনুসরণ করতে শুরু করে।

কুরআন ও হাদিসে স্পষ্টভাবে সতর্ক করা হয়েছে, অন্য কোনো জাতির অন্ধ অনুসর করতে। এই সতর্কবার্তা প্রমাণ করে যে, মূল্যবোধের পরিবর্তন কোনো ছোট ব্যাপার নয়।

এরপর ইসলাম যে পথ দেখিয়েছে, তা হলো প্রতিকার, প্রতিরোধ ও সুস্থ সমাধান। ইসলাম কখনো কাউকে সংস্কৃতিহীন হতে বলে না, বরং নিজের মূল্যবোধ মজবুত রাখতে বলে। মুসলিম পরিবার যদি নিজের পরিচয়কে আকড়ে ধরে, নিজের মূল্যবোধের ওপর আস্থা রাখে এবং কুরআন-সুন্নাহ মোতাবেক জীবন পরিচালনা করে, তবে যে কোনো আগ্রাসনকে পরাজিত করা সম্ভব। পাশাপাশি সমাজে আলেম-উলামা এবং পরিবারের বয়োজ্যেষ্ঠদের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ; তারা যদি মূল্যবোধ ধরে রাখে, তাহলে পরবর্তী প্রজন্মও তাদেরকে অনুসরণ করে নিজেদেরকে রক্ষা করবে।

পরিশেষে বলা যায়, নিজেদেরকে এবং পরিবারকে সঠিক পথে পরিচলনার জন্য ধর্মীয় মূল্যবোধ যেমন জরুরী; তেমন জরুরী পশ্চিমা আয়নায় দুনিয়া দেখার চশমা খুলে ফেলা। যখন পশ্চিমাদের সংস্কৃতিকে অপ-সংস্কৃতি হিসাবে দেখবেন, তখন নিজের সংস্কৃতিকে উত্তম মনে হবে। পশ্চিমাদের সংস্কৃতি অনুসরণ করলে দুনিয়া-আখিরাত ধ্বংস হবে। তাই মুসলিমদের জন্য সর্বোচ্চ প্রয়োজন নিজেদের ধর্মীয় পরিচয়কে আকড়ে ধরা এবং পশ্চিমা

প্রভাবের ভিড়ে হারিয়ে না যাওয়া। আল্লাহ আমাদের পরিবারগুলোকে হেফাজত করুন এবং সঠিক পথে পরিচালিত করুন—আমিন।

তথ্যসূত্র

[১] সূরা আল হুজুরাত, আয়াত ১৩
[২] সূরা আর-রূম, আয়াত ২১
[৩] সূরা রাদ, আয়াত ৩৮
[৪] সুনানে ইবনে মাজাহ : ১৮৪৭
[৫] সুনানে আবু দাউদ : ২০৫০
[৬] সূরা আন-নূর, আয়াত ২৬
[৭] সূরা আন-নূর, আয়াত ৩
[৮] সূরা নিসা, আয়াত ৪
[৯] সহীহ বুখারী : ৫১৫০
[১০] সূরা বাকারাহ, আয়াত ১৮৭
[১১] সূরা নিসা, আয়াত ৩৪
[১২] সহীহ মুসলিম : ১২১৮
[১৩] সহীহ ইবনে হিব্বান : ৪১৬৩
[১৪] সূরা আহকাফ, আয়াত ১৫
[১৫] সূরা নিসা, আয়াত ৩৬
[১৬] জামে আত তিরমিজি : ১৮৯৯
[১৭] মিশকাত শরীফ : ৪২১
[১৮] সহীহ বুখারী : ২৫৫৪
[১৯] তাফসীরে তাবারী ১১/১২৬
[২০] সূরা নিসা, আয়াত ১১
[২১] Prosperous British India, Sir William Digby
[২২] তুহফাতুল মাওলুদ ফী আহকামুল মাওলাদ, পৃষ্টা ১৬
[২৩] সূরা আহযাব, আয়াত ৫৯
[২৪] সুনানে তিরমিজি ৪/৫৭
[২৫] যাম্মুল হাওয়া ২০৮
[২৬] Psychiatrists in a shift, Declare Homosexuality no mental illness, Times Dec 16,1973
[২৭] সূরা মায়িদা, আয়াত ৭৭

[২৮] সূরা মায়িদা, আয়াত ৫১

[২৯] সূরা আনকাবুত, আয়াত ৬৪

[৩০] সূরা বনী ইসরাঈল, আয়াত ৩২

[৩১] সহীহ বুখারী : ৭৩২০

[৩২] সুনানে আবু দাউদ : ৪০৩১

[৩৩] সূরা জাসিয়া, আয়াত ১৮

[৩৪] সুনানে আবু দাউদ : ৪৩১

[৩৫] সূরা বাকারাহ, আয়াত ১৩৮

[৩৬] সহীহ মুসলিম : ৫৯

[৩৭] সহীহ বুখারী : ৫২২৩

[৩৮] সূরা তাহরীম, আয়াত ৬

[৩৯] সূরা আশ-শামস, আয়াত ৯

[৪০] সূরা যারিয়াত, আয়াত ৫৬

[৪১] সুনানে তিরমিজি : ৩৩৭১

[৪২] সুনানে ইবনে মাজাহ : ৩৮২৭